শতাব্দীর কল্পতরু

নন্দলাল ভট্টাচার্য

৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রকাশ করেছেন :
লিপিকার পক্ষে
ডি. চক্রবর্তী
৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

Satabdir Kalpataru
By
Nandalal Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বিন্দুভূষণ পাল

ছবি তুলেছেন
কাঞ্চন নিয়োগী

মুদ্রণে
করুণাময়ী প্রেসের পক্ষে
পি. ভট্টাচার্য
৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন,
কলকাতা-৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "অজোঽপি সন্নব্যয়যাত্মা ভূতানামী-শ্বরোঽপি সন্ প্রকৃতিং স্বামাধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" যাঁর জন্মাদি নাই, তিনিই নরদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন—যুগপ্রয়োজনে ও ধর্মসংস্থাপনার্থে। এ রহস্য উদ্ঘাটিত হয় বহু পুণ্যফলার্জিত শুদ্ধ ও ভক্তি বিশ্বাসপূর্ণ চিত্তে। তাই শ্রীভগবান পুনরায় বলেছেন, "জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন। যিনি মায়াধীশ ত্রিগুণাতীত পূর্ণব্রহ্ম তিনিই মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ—যিনি এরূপ বিশ্বাস করতে পারেন তাঁর পুনর্জন্ম হয় না।

যিনি সাক্ষাৎ "বেদমূর্তি" সমগ্র বেদবেদান্তের সিদ্ধান্ত ও সর্বধর্মের মূর্তপ্রতীক তিনিই এ যুগে "জগৎস্থিত যুগ-ঈশ্বর" — শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। তাঁর বাল্যলীলা ও সাধকলীলা সমাপনান্তে যখন তাঁর পবিত্রতম স্থূলদেহ ক্যান্সাররোগে আক্রান্ত তখন তাঁর অন্ত্যলীলার প্রথম পর্ব—শ্যামপুকুর বাটীতে এবং শেষার্ধ লীলা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল স্তরের ভক্তদের, চিকিৎসকের ও শরণাগত ও অনুতপ্ত অভিনেত্রীর সহিত লীলা করেছেন বিশেষতঃ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ত্যাগীভক্তদের সঙ্ঘবদ্ধ করা। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তদের নির্বাচন এবং অধিকারভেদে আত্ম-প্রকাশে অভয় প্রদান (যা 'কল্পতরু" নামে সাধারণে প্রসিদ্ধ) ভক্তবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত আস্বাদন করে পরমতৃপ্তি লাভ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—"মিশ্রীর রুটি সিধে করে খাও অথবা আড় করেই খাও, মিষ্টি লাগবে"।

রসস্বরূপ লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ত্যলীলা শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য লিখিত "শতাব্দীর কল্পতরু" পুস্তিকায় অত্যন্ত সাবলীল ও সুললিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এই অনবদ্য রচনা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তচিত্তে রস পরিবেশন করে তাঁদের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা আরও বর্দ্ধিত করবে সন্দেহ নাই।

স্বামী নির্জরানন্দ
সম্পাদক, উদ্বোধন

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়
পূজনীয়েষু

ক'টি কথা

ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বাস।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দিয়েছেন আশ্বাস—শতবর্ষ ধরে তিনি থাকবেন ভক্তের হৃদয়মন্দিরে, তারপর আবার আসবেন তিনি। আসবেন নবরূপে।

তাই তাঁর সে অন্ত্যলীলা বিষাদের হলেও পরম আশ্বাসের। শুধু তাই নয় শতবর্ষ আগে চরম যন্ত্রণার মধ্যেও পরম অভয়রূপে তাঁর প্রকাশ কল্পতরু হিসেবে। সেদিন অকাতরে তিনি বিতরণ করেছেন কৃপা। কোন ভেদ মানেননি, কাউকে দূরে ঠেলেননি।

আবার এই অন্ত্যলীলাপর্বেই তিনি নিজের হাতে তাঁর বারোটি ত্যাগী সন্তানের হাতে তুলে দিয়েছেন গৈরিক বস্ত্র—যাঁরা শিবজ্ঞানে জীবসেবা র মহামন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন একটি মহা সংস্কার—যার উদার আশ্রয়ে হচ্ছে কত মানুষের তাপহরণ—পাপহরণ।

আজ থেকে মাত্র শতবর্ষ আগে তাঁর এই লীলাভিসার। সেই পর্বের অন্যতম লীলা তাঁর এই কল্পতরু রূপের প্রকাশ। সেটিই আমাদের উপজীব্য। কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে বলরামভবন, শ্যামপুকুরবাটী এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীর কথা। মূলত কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ও শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ আর লীলামৃত-র অনুসরণে—এ শুধু ফিরে লেখা। এরই মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে স্মরণ—তাঁকেই পূজা করা।

প্রত্যাশা নয়, পূজার তৃপ্তিতেই এ পূজা। পূজার উপাচার সংগ্রহে যাঁদের পেয়েছি সহযোগিতা তাঁদের সবাইকে তাই জানাই প্রণাম।

নন্দলাল ভট্টাচার্য
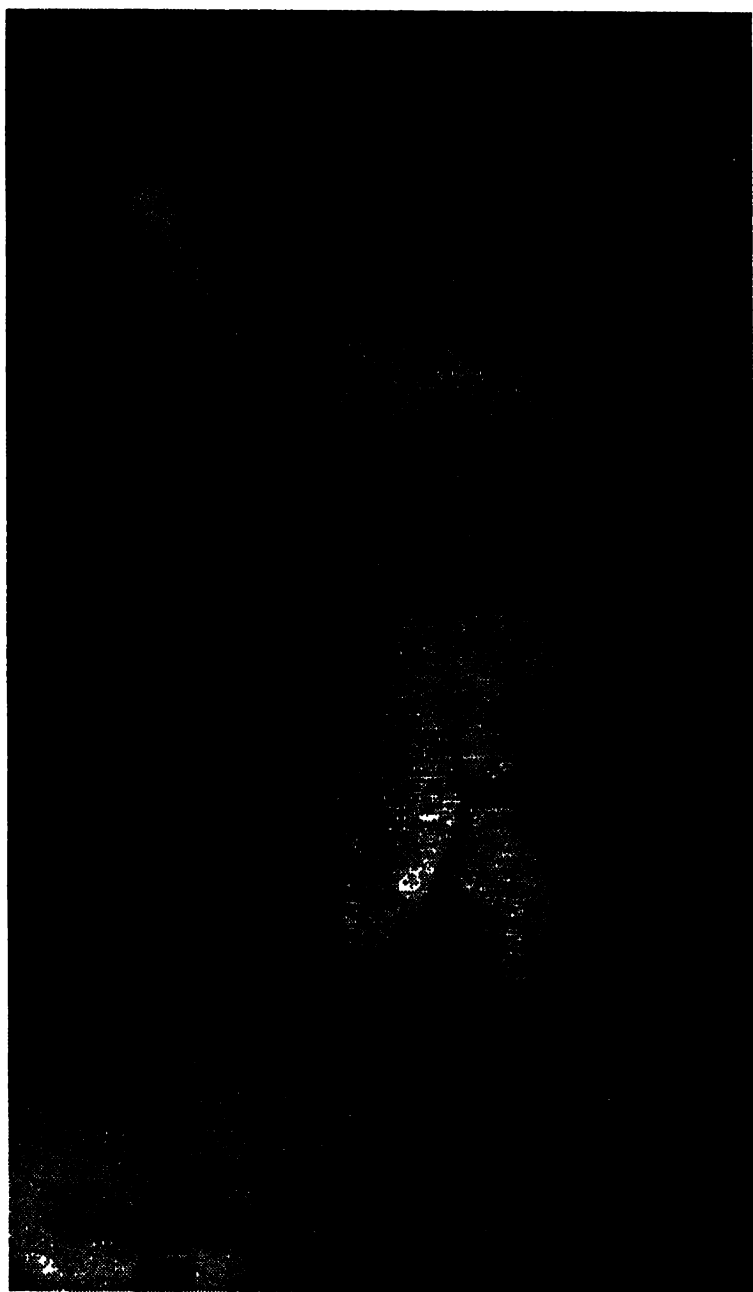
ভাবসমাধিস্থ ঠাকুর

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র
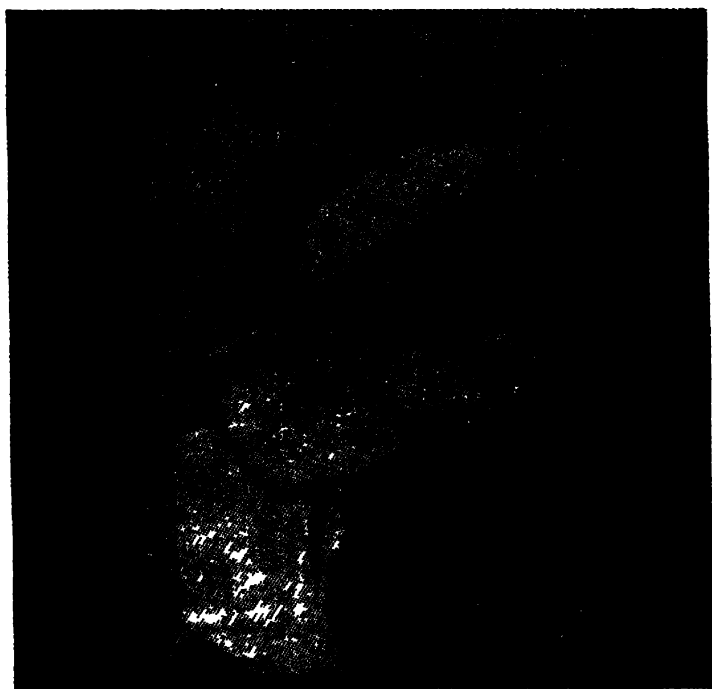
পুরুষবেশে নটী বিনোদিনী

কাশীপুর মহাশ্মশানে
শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিমন্দির

শ্যামপুকুর বাটী

কাশীপুর উদ্যানবাটী
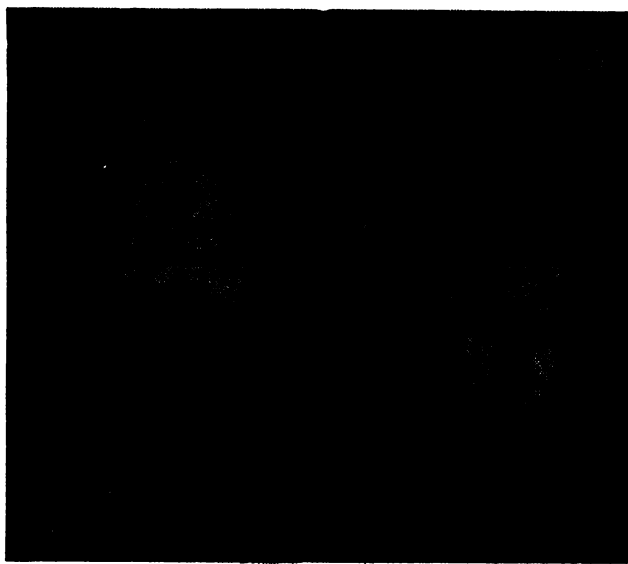
মহাপ্রয়াণের পর ঠাকুরের স্থূল দেহ ঘিরে বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভক্তের দল।

কাশীপুর উদ্যানবাটী।

নতুন তীর্থ আবার মহাবিদ্যালয়।

বৈভবের প্রকাশ আর পার্থিব আনন্দর জন্য যে উদ্যানবাটীর স্থাপনা —তার হ'ল রূপান্তর। জন্মান্তরও বটে।

যুগত্রাতা যিনি—যুগের প্রয়োজনেই যাঁর আবির্ভাব—ভক্তের ক্রন্দনে—আকুলতায়—সেই অবতারবরিষ্ঠ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে ধন্য—বিলাসের ভূমি—মন্দিরে পরিণত হয়ে হ'ল সাধনার ক্ষেত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলার ভূমি উদ্যানবাটী ভবিষ্যতের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সূতিকাগার।

মহাপ্রস্থানের আভাস তখন ঠাকুরের লীলায়। মহাজাগরণের—মহাউদ্বোধনের প্রকাশ তখন তাঁর প্রতিটি কর্মে। অনেক খেলাতো হয়েছে শেষ—এবার খেলা ভাঙার খেলা। আবার ভাঙার মধ্যেই গড়ার ইঙ্গিত। সংহারের মধ্যেই সৃজন। যেমন অসুরনাশের মুহূর্তেও দেবীর হাতে মাঙ্গল্যের প্রতীক লীলাকমল।

একদিকে অন্তরঙ্গ পরিকর বাছাই—অন্যদিকে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার—নিঃশেষ করার প্রস্তুতি। ঠাকুরের কথায়, কর্মে তখন বিচিত্রলীলার আবেশ। "হাটে হাড়ি ভেঙে"—স্বরূপ স্বরাট-বিরাটের প্রকাশ দেখিয়ে আবার স্বরূপেই লীন হবার সেই লগ্ন—বিষাদের—আনন্দের। যারা থাকার তারা থাকবে, যারা যাবার তারা যাবে। তাই তো এই লীলা।

লীলা ছাড়া আবার কি? পাপহরণ করেছেন তিনি আবার সেই পাপের তীব্র দহনে দগ্ধ হয়েছেনও তিনিই। তিনি নীলকণ্ঠ—আবার সেই বিষের জ্বালায়—নীল তাঁর অঙ্গ—তীব্র জ্বালায়—চিরশীতল হবার অভীপ্সা তাঁর মনে।

তিনি তো অবতার—তবে কেন তাঁর এই রোগ ভোগ—কেন তাঁর এই যন্ত্রণাকাতর পাণ্ডুর বর্ণ? কেন? কেন?

কেন-র উত্তর যাঁরা পেলেন না—তাঁরা ত্যাগ করলেন তাঁর সঙ্গ। কিংবা ত্যাজ্য করলেন নিজেকেই। আর যাঁরা তাঁর এই যন্ত্রণার মধ্যেও দেখলেন তাঁর

লীলারই প্রকাশ, বুঝলেন—মানুষের জন্যই তাঁর এই ভোগ—তাঁর এই আত্মত্যাগ ক্রুশিফিকেশন—তাঁরা আরো গভীরভাবে—আরো নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সেবায় নিয়োগ করলেন নিজেকে। ধন্য হলেন।

সেবার চেয়ে বড় পূজা—বড় সাধনা আর কি আছে? সব সাধনার—সব আরাধনার সেরা যে ওই সেবা! প্রাণমন ঢেলে সেবা করো। ও সেবা তো ওই খোলটার সেবা নয়—ও যে সেই পরমেরই সাধনা।

সেদিন রাত্রে আশা-নিরাশার দোলায় যখন দুলছেন ভক্তের দল—শায়িত ঠাকুরের মুখে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রও যখন নিথর—নিশ্চল—ঠিক সেই মুহূর্তে কি এক অপূর্ব লীলার প্রকাশে ঠাকুর হলেন উল্লসিত। উঠে বসলেন তিনি শয্যায়। আশ্চর্যময় এক তত্ত্বের অবতারণায় হলেন বাঙ্ময়।

দেখ তোমরা সব সচ্চিদানন্দ সাগরের কথা বল। সে সাগরের স্বরূপ দর্শনে কিংবা বিচারে তোমাদের কত আগ্রহ—কত বাগ্‌বিতণ্ডা। অথচ তোমরা জান না, সচ্চিদানন্দ সাগর অপার—অতলস্পর্শ। সেই সাগরে যে কি আছে আর কি নেই তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না—তিনি ছাড়া আর কেউ বলতেও পারে না তা—দিতে পারে না বর্ণনা। এমনকি শ্রুতি পর্যন্ত এখানে নির্বাক।

জ্ঞানগুরু সদাশিব মহাদেব নেমেছিলেন এই সচ্চিদানন্দ সাগরের মাত্র হাঁটু-জলে—পান করেছিলেন মাত্র তিন গণ্ডূষ জল—তাতেই তিনি ভোলা মহেশ্বর।

মানুষের মধ্যে শিব অংশে যাঁর জন্ম সেই ব্যাসপুত্র শুকদেব দূর হতে দেখেছিলেন সেই সচ্চিদানন্দ সাগর। তাই তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ।

বিষয়বিরাগী নারদাদি ঋষিবৃন্দ সে সাগর দর্শনও করেননি—দূর হতে শুনেছেন শুধু কলকল্লোল—তাতেই তাঁরা কৃতকৃতার্থ। আর জীব—সে তো তাঁর বাতাসেই যায় গলে—দর্শন তো অনেক দূরের কথা।

সচ্চিদানন্দর প্রসঙ্গ অনুধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র ভাবতরঙ্গের প্রকাশ তখন তাঁর দেহে মনে, সারা অঙ্গে। সে প্রসঙ্গ আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত কণ্ঠদেশ থেকে উৎসারিত হতে থাকে রুধির ধারা। অবিনাশী সেই রক্তপ্রবাহ দেখে ভক্তকুল ত্রাসিত।

কিন্তু ঠাকুর আমাদের, প্রভু আমাদের নীলকণ্ঠ। স্মিত আস্যে বলে ওঠেন তিনি, 'গিরিশ, কি দেখছ? এতে কি আর প্রাণ বাঁচে?'

তাঁর ভাব, তাঁর সে কথা শুনে সবারই হৃদয়ে গুড়গুড়িয়ে ওঠে আশঙ্কায়

মেঘ। বুঝি চরম সর্বনাশের কাল সমাগত। বুঝি এখন নেভে নিবাত নিষ্কম্প ওই দীপশিখা।

আশঙ্কিত ভক্তদের সান্ত্বনা দিতে কিংবা শিক্ষা দিতেই আবার উচ্চারিত হ'ল ধ্বনি, 'মানব! তোমাদের কল্যাণকামনায় রক্তদান করলাম, এমন কি, প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু ভগবানের জন্য তোমরা কতটুকু মনপ্রাণ দিলে?'

এ জিজ্ঞাসা একজনের নয়। তিনি তো বারবার বলেছেন, 'আমি ষোল টাং করে গেলাম যদি তোরা এক টাং করিস। যদি ষোল দেখে অন্তত এক হতে চাস। যদি মহৎকে দেখে অণু হবারও প্রেরণা জাগে। তবু কই, তেমনভাবে তো ডাকতে পারিনে, ভাবতেও পারিনে। এ আর্তি চিরকালের। চিরদিনের।

শয্যায় ঠাকুরের দৃষ্টিতে তখন ঝরছে শুধু কৃপা। শান্ত। সুন্দর। করুণাঘন দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে মোহিত সবাই। তাপহরণের পর শীতলতা। দুঃখহরণের পর সুখের আবেশ। মালিন্য হরণের পর শুভ্রতা।

শুভ্রতার আলোয় তখন চারিদিক দেদীপ্যমান। ঠাকুরের অঙ্গে স্বস্তির শান্তভাব। সে ভাব দেখে আরেক ভাবে ভাবিত গিরিশচন্দ্র বলেন, অনধিকারী আমি, কোন জ্ঞান, কোন সুকৃতি নেই আমার। তবু তুমি করুণাসিন্ধু, অফুরন্ত কৃপা তোমার তাই শোনালে পরাজ্ঞানের কথা। যদি শোনালেই তবে বঞ্চিত করবে কেন? বল তবে, পরাভক্তিই বা কি? কি তার স্বরূপ?

কথার পরে কথা। উতোরের পর চাপান। প্রশ্নের পর জবাব। সব সময়ই কি তাই? অন্য কিছু অন্য কোনও রূপ নয়?

নয়ই বা কেন? তাই ঠাকুর এবার নীরব। শয্যার পাশ থেকে একটু ধুলো নিয়ে তিনি রাখলেন মাথায়। আবার স্ফুরিত হল বাক্য। অন্য রূপে—অন্য ভাবে।

'ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত। নামে তিন হলেও বস্তুতঃ এক। তোমরা ঈশ্বরের ভক্ত। অতি পুণ্যময় সচ্চিদানন্দর কথা তোমরা সকলে শুনলে, তোমাদের পদরেণুতে এ স্থান পবিত্র হয়েছে; তাই আমি আজ ভক্তগণের পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হলাম।'

কথায় নয়, ইঙ্গিতে—উদাহরণে নরনারায়ণ সেদিন বোঝালেন, হীনের হীন দীনের দীন হতে না পারলে দেবদুর্লভ পরাভক্তির উদয় হয় না হৃদয়ে, অনুভব করায় না সে ভক্তির বিলাসকে।

'যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি, এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল, ফুঁ দিয়ে জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে আমার চোক্ গেল, হাড় মাটি হ'ল—অত করতে আমি পারব না, তোর সখ থাকে তুই করগে যা! ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দুই এক কথা বলে দিলেই চৈতন্য হবে।'

দক্ষিণেশ্বরে জগজ্জননীর কাছে অভিমানী ছেলের মতই ঠাকুর যেন নালিশ করে যাচ্ছেন মা'র কাছে।

১৮৮৪ সালের শেষদিক থেকেই ঠাকুরের কাছে ভক্তের দল আসতে থাকে যেন বেনো জলের মত। সে স্রোতে যেমন ছিল ভাল লোকের দল তেমনি মহা পাপীতাপীও তাঁর চরণ স্পর্শ করে পেয়ে যাচ্ছিল পার।

তারা পার পাচ্ছিল সত্যি কিন্তু মাশুল দিতে হচ্ছিল ঠাকুরকে। হবে না কেন? তিনি যে প্রকৃতির বেগ দিচ্ছিলেন ঘুরিয়ে। পাপ হরণ করে হচ্ছিলেন পাপীতারণ—তাই পাপের তাড়না এসে পড়ে তাঁরই ওপর। মায়ের মুখ ঝামটাও খেতে হয় তাঁকেই।

কিন্তু তিনি তো নিজের ইচ্ছেয় কিছু করছিলেন না। সবই তো করিয়ে নিচ্ছিলেন মা-ই। তাই মা-র কাছে তাড়া খেয়ে উঠোনে পিছলে পড়ে ছোট ছেলে যেমন ছুটে আসে আবার মারই কাছে, তেমনি মা-র কাছেই নালিশ করেন ঠাকুর।

'এত লোক কি আনতে হয়? একবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস। লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না! একটা তো এই ফুটো ঢাক (নিজের শরীর লক্ষ্য করিয়া), রাতদিন এটাকে বাজালে আর কতদিন টিকবে?'

হ'লও তাই। ১৮৮৫ সালের মার্চ এপ্রিল থেকেই তিনি হলেন রোগাক্রান্ত। গলায় ব্যথা। অনর্গল অমৃতবাণী বিতরণের পর তিনি কাহিল হলেন গরল প্রভাবে।

এটা কি হঠাৎ কোন ব্যাপার, নাকি পূর্ব নির্দিষ্ট। মা-ই তাঁর এই 'ফুটো হাড়-মাসের খাঁচাটি' নিয়ে নতুন এক খেলার অবতারণা করে রেখেছিলেন নিজেই? ঠাকুরও কি আগেই জানতেন সে কথা? যদি নাই জানবেন, তবে কেমন করে

বললেন, 'অধিক লোক যখন দেবজ্ঞানে মানবে, শ্রদ্ধা ভক্তি করবে তখনই এর অন্তর্ধান হবে।'

দেহাবসানের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন ১৮৭৯।৮০ সালেই। মা সারদামণিকে তিনি বলেছিলেন, 'দেখো, যখন যার তার হাতে খাবো, কলকাতায় রাত কাটাবো, খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে নিজে বাকিটা খাবো, তখনই জানবে দেহরক্ষা করার আর খুব দেরি নেই।'

একে একে ঘটতে থাকল সবই। জানা থাকলেও যেন বিধির বিধানেই দক্ষিণেশ্বরে এলো ভক্তস্রোত। সেই স্রোতোবেগকে সামাল দিতেই তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেই—তাদের কৃপা করতেই ঠাকুর অনেকের হাত থেকে গ্রহণ করলেন খাদ্য, রাত্রিও কাটালেন কলকাতায় বলরাম মন্দিরে আবার অসুস্থ নরেন্দ্রনাথকে পথ্য দিতে নিজেই জোর করে মা-কে দিয়ে দেওয়ালেন তাঁর খাদ্যের অগ্রভাগ। সে অন্ন দিতে গিয়ে মা সারদা মাঝে মাঝেই উঠেছিলেন কেঁপে ভীষণ অমঙ্গলের আশঙ্কায়, কিন্তু ঠাকুরের মুখের শিশুর হাসিটি তাঁর সব কিছু দিয়েছিল ওলটপালট করে। আশঙ্কায, আনন্দে সেদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেন অন্ন।

১৮৮৪ সালের এপ্রিল। ঠাকুরের গলায় ব্যথা। বললেন, 'কে জানে বাপু। আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষরাত্রে বড় কষ্ট হয়। কি সে ভাল হয় বাপু।'

নিজেই যিনি মহাবৈদ্য তিনি জিজ্ঞাসা করছেন কে এক নবিসকে—কিসে ভাল হবেন তিনি? এ লীলার অন্ত পাওয়া ভার।

গরমে কষ্ট পাচ্ছেন দেখে ভক্তরাই বিধান দিলেন ঠাকুরকে—একটু একটু করে বরফ খান। তা বরফ খেয়ে ঠাকুর বেশ ভালই রইলেন। তাঁকে ভাল থাকতে দেখে ভক্তরা আরো বেশি বেশি করে বরফ পাঠাতে থাকেন। বেশি মাত্রায় বরফ খেয়ে ঠাকুর হলেন আরো অসুস্থ।

ভক্তরা ভাবলেন বুঝি ঠাণ্ডা লেগেই ঠাকুরের কণ্ঠ তালু কিছুটা ফুলেছে। একটা প্রলেপের ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন। কিন্তু ফল তেমন হ'ল না।

এবার আনা হ'ল বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারকে। সব দেখে শুনে তিনি বিধান দিলেন, অন্তত কয়েকদিন যেন ঠাকুর কথাবার্তা একদম না বলেন, আর বারবার যাতে সমাধিস্থ না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যও নির্দেশ দিলেন ভক্তদের। গলার মধ্যে এবং বাইরে লাগাবার জন্য দিলেন তিনি একটা ওষুধ।

ভক্তরা সতর্ক থাকেন। কিন্তু ঠাকুর নিজেই তাঁর বিদায়ের ক্ষণটিকে ত্বরান্বিত

করতে মাতলেন অন্য লীলায়। জ্যৈষ্ঠের শুক্লাত্রয়োদশীতে পানিহাটিতে গেলেন চিঁড়া মহোৎসবে যোগ দিতে।

সেদিন সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করেই মাতলেন কীর্তনে—উদ্দাম নৃত্যে। ভক্তজনকে কৃপা করলেন অযাচিত ভাবেই। পরিণতিতে বাড়ল গলার ব্যথা। একজন জিজ্ঞেস করল—অসুখটা বাড়ালেন কি করে? সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলেটির মত ভয়ে ভয়ে ঠাকুর বলেন, মাইরি এতে আমার কোন দোষ নেই। হরিনাম সংকীর্তনে আমি আত্মহারা হই জেনেও রাম কাল আমাকে পেনেটির চিঁড়ার মহোৎসবে নিয়ে যায়। অবশ্য সঙ্গে তোদের দুচারজন ছিল। সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে নৃত্য করায় ঠাণ্ডা লেগে গলায় একটু বেদনা হয়েছে।'

ভক্তটি রামচন্দ্র দত্তের ওই কাজের প্রতিবাদ করে বলল ডাক্তার হয়েও রাম দত্ত ওই কাজ করলে? সঙ্গে সঙ্গে ভক্তকৃপাসিন্ধু বলে ওঠেন, 'ভাবিসনে, দু চারদিন সাবধানে থাকলে ভাল হয়ে যাবে!'

কিন্তু রোগ বাড়ে। আসে অন্য ডাক্তার। আরো ডাক্তার। সবাই মিলে পরীক্ষা করে বললেন, এ অসুখের নাম 'ক্লারজিম্যানস থ্রোট সোর'। ধর্মযাজক—ধর্মপ্রবক্তাদেরই হয় এই রোগ। অতিকথন—মূল কারণ। ডাক্তার ওষুধপথ্যর ব্যবস্থা করলেন। বারবার বললেন, কথা একদম বলবেন না, সমাধিস্থ হবেন না একবারও।

ডাক্তাররা বললেন তাঁদের কথা। কিন্তু যিনি পাপনাশন জীব উদ্ধারে নিয়েছেন সদাব্রত—যিনি বাঙ্ময়-মুখর তিনি কেমন করে হবেন নীরব? কেমন করে রুদ্ধ করবেন সমাধির বেগ আর অনর্গল বাগধারাকে? যদি করেন তাহলে যে জন্য তাঁর আসা, সেই কাজই যে থেকে যাবে অসম্পূর্ণ।

তাই বোধহয় যাবার আগে রাঙিয়ে নেবার জন্যই তিনি হলেন আরো মুখর। কৃপাবিতরণে হলেন আরো উদার।

সেপ্টেম্বর মাস। রোগ না কমে আরো বাড়ল। তালুর সেই স্ফীতদেশ থেকে নির্গত হ'ল রুধিরধারা। সেই কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ বললেন তাঁর এক বন্ধুকে, 'আনন্দের হাট বুঝি এবার ভাঙল। যাঁকে নিয়ে এত আনন্দ তিনি নিজেই বোধহয় সরে যান এবার। ডাক্তারি বই পড়ে ডাক্তার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে জেনেছি এরকম কণ্ঠরোগ ক্রমে পরিণত হয় ভয়ঙ্কর ক্যান্সারে। আজ রক্ত পড়ার খবর শুনে আমার তাই মনে হচ্ছে। এ রোগের যে কোন ওষুধ নেই।'

ওষুধ যখন নেই—তখন কি নিশ্চেষ্ট থাকব? নিষ্ফলের হতাশায় শুধুই

ফেলব দীর্ঘশ্বাস ? তাও কি কখনও হয়। তাঁকে নিয়ে আসবো কলকাতায়—দেখাবো ভাল ভাল চিকিৎসক। বলা তো যায় না—ভালও তো হতে পারেন।

নরেন্দ্রনাথ, মাস্টারমশাই, গিরিশ ঘোষ, রাম দত্ত, দেবেন মজুমদার প্রভৃতি মিলে ঠিক করলেন ঠাকুরকে নিয়ে আসবেন কলকাতায়। এখানেই করবেন তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।

তাঁদের কথায় রাজি হলেন ঠাকুর। অক্টোবরের প্রথমে বাগবাজার দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটের একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করে এসে সেইখানে আনা হ'ল ঠাকুরকে। কিন্তু তিনি বাড়িতে ঢুকেই সবকিছু দেখে বললেন, এই বদ্ধ জায়গায় আমি থাকতে পারব না। তোমরা বলছ ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যায়। কিন্তু এই ঘরে থাকলে আমি দমবন্ধ হয়ে মারা যাব।

শুধু বলা নয়, ধুলো পায়েই ঠাকুর রওনা দিলেন রামকান্ত বসু স্ট্রীটের দিকে—বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানে তিনি থাকলেন সাতদিন। তার মধ্যে ভক্তরা ৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীটে গোকুল ভট্টাচার্যের বাড়িটি ভাড়া নেন। এখানকার পরিবেশ পছন্দ হয় ঠাকুরের। এ বাড়িতে তিনি উঠে আসেন ১৮৮৫ সালের ২ অক্টোবর। আসেন শ্রীমাও।

আপনিই তো কথা বলতে একদম বারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু নিজে যে ৬।৭ ঘণ্টা করে কথা বলছেন, বলাচ্ছেন, তার বেলা ?

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একথায় একটু থতমত খেয়ে হেসেই বলেন, 'আমার সঙ্গে কথা বলায় দোষ নেই। আমি ডাক্তার। আমি জানি কেমন করে কথা বলতে হয়, বলাতে হয়।'

বলরাম বসুর বাড়িতে যখন ছিলেন ঠাকুর তখনই ভক্তের দল নিয়ে আসেন গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি কবিরাজকে। তাঁরা নানাভাবে দেখলেন ঠাকুরকে। তারপর বললেন, 'দুশ্চিকিৎস্য রোহিণী' রোগ হয়েছে ঠাকুরের। নিদান হেঁকে গেলেন তাঁরা। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন বললেন, দেখ, ডাক্তাররা যাকে বলে ক্যান্সার, রোহিণী হ'ল তাই। শাস্ত্রে এর

চিকিৎসার কথা আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই অসাধ্য বলে তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। তাই বলছি, আমরা অপারক। কবিরাজদের সে কথায় ভক্তরা আকুল। আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় তাঁদের হৃদয় গুরু গুরু। পরমকে হারানোর আশঙ্কায় শূন্যতার এক গুরুভার তখন তাঁদের অন্তরে। অথচ প্রভু তাঁদের— ঠাকুর তাঁদের ওই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে—কালব্যাধির ওই মারাত্মক ক্রিয়াকালেও হাসছেন—অভয় দিচ্ছেন—শিক্ষা দিচ্ছেন। এ কী অপূর্ব বেশে তুমি সেজেছ নাথ? এ কী অপূর্ব তোমার লীলা? লীলাময় তোমার লীলা তুমিই বোঝ— তুমিই জানো—সে লীলাবিলাস বর্ণনার সাধ্য কোথায় আমাদের?

চরম বিপর্যয়ের মুখেও মানুষ চায় আশ্বাস। সেটাই স্বাভাবিকতা। জীবনের ধর্ম। সামান্যও তখন হয়ে ওঠে অসামান্য। তাই একজন যখন বললেন, কবি-রাজিতে যদি ওষুধ না থাকে—তবে হোমিওপ্যাথি করানো হোক না কেন?

সবাই একবাক্যে সায় দিলেন তাতে। প্রিয় থেকে প্রিয়তর যিনি—তাঁর সেবায় অন্য যে কোন ভাবে—যা হোক কিছু করতে পারলেই ভক্তরা খুশি। ঠাকুরকে ভাল করতে পারলে যে তাঁদেরই লাভ—আবার ঠাকুর ভাল হয়ে উঠলে লাভবান হবে বিশ্ব—পাপতারণ তিনি পাপহরণ করবেন আরো—আরো মানুষকে দেখাবেন পথ—সুন্দরের।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

সেই কৃষ্ণরূপ রামকৃষ্ণের প্রীতি ইচ্ছায় প্রেমে তখন উদ্বোধিত ভক্তের দল। ঠিক করলেন, কলকাতার শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকেই দেখাবেন তাঁরা।

ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হ'ল শ্যামপুকুর বাটীতে। ডাঃ সরকার এলেন— দেখলেন ঠাকুরকে। কিংবা ঠাকুরই দেখা দিলেন তাঁকে। বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিয়ে পরমহংসের চিকিৎসা করতে এসে শেষে নিজেই হলেন চিকিৎসিত।

আচ্ছা, এই যে তোমাদের ঠাকুর—পরমহংস—এঁর চিকিৎসা—থাকা খাওয়ার খরচ চলছে কি করে? চিকিৎসা করতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার সরকার।

কেন? আমরাই দিচ্ছি। যার যা সাধ্য সেইমত চাঁদা দিচ্ছি আমরা— তাতেই হচ্ছে সব—হয়ে যাচ্ছে।

ও। একটু যেন গম্ভীর হলেন ডাঃ সরকার। সবাই ভাবেন—কি জানি ঠিকমত ফিজ্ পাবেন কিনা সেকথাই হয়ত ভাবছেন ডাক্তার। যেই একজন বলেন, ফিজের জন্য ভাববেন না। সে ঠিকমত পেয়ে যাবেন। আপনি শুধু ভালভাবে চিকিৎসা করুন।

সে কথায় যেন মরমে মরে গেলেন ডাক্তার। হেঁকে উঠলেন তিনি,—আমি কি আমার পারিশ্রমিকের কথা বলেছি? এত নীচ ভাবো তোমরা আমাকে? আমি শুধু জানতে চেয়েছি—এত খরচ কিভাবে সামলাচ্ছো তোমরা?

ভক্তের দল বুঝতে পারেন নিজেদের ত্রুটি। লজ্জা পান তাঁরাই। ডাক্তার সরকার বলেন, দেখো, একটা সৎকাজ—মহৎ কাজ করছ তোমরা। তোমাদের একাজে আমিও সাধ্যমত সাহায্য করতে চাই। আমি ফিজ চাই না। বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করবো তোমাদের ঠাকুরের।

এ কি বিস্ময়। জড়বাদী ডাক্তার নিজেই যে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন ঠাকুরের পায়। এ কেমন করে হ'ল?

ঠাকুর কিন্তু কথাটা শুনে একটু হাসেন। ভাবখানা—ওরে দেখবি—দেখবি আরো কত। এমনি কত অবিশ্বাস—কত সন্দেহ—কত সংশয় হবে দূর—আরো কত—কতজন পড়বে এই পায়ে লুটিয়ে। ওরে যাবার আগে হাটে হাঁড়ি আমি ভেঙে দিয়ে যাব। তখন বুঝবি—কে আমি? কি জন্য আমি এসেছিলাম—কি করে গেলাম?

না, তাতেও বোঝা যায়নি সব। যিনি অনন্ত অসীম তিনি ধরা দিলেই কি পরিমাপ করা যায় সব? বাটির জলে প্রতিবিম্বিত হয় আকাশ সূর্য—তাই বলে তাতে কি ধরা যায় তাকে? কিংবা বোঝা যায় তার স্বরূপ? আভাস পেয়েও অন্ধের মতই তাই হয় হাতড়াতে।

ডাক্তারেরও হয়েছে তাই। ঠাকুর তাঁর রোগী। চিকিৎসা করতে এসেছেন তাঁর। কিন্তু কি জ্বালা—দিনরাত যে শুধু ওই ঠাকুরটিরই ভাবনা। এ কি জ্বালা, না আনন্দ! এ কি সব হারানো, না সব প্রাপ্তি? বুঝতে পারেন না ডাক্তার। তাই আক্ষেপের সুরেও আনন্দের ছোঁয়া। সেদিন বলছিলেন তাঁর মাস্টারমশাইকে, কি বলব স্যর, রাত তিনটে থেকে ওই পরমহংসের ভাবনা শুরু হয়েছে। ঘুম নেই। এখন এই সকাল সাতটা। এখনও সেই পরমহংস চলছে।

শুনতে পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখছেন তাঁকে, আপনার কি মনে হয় তাঁকে?

সে প্রশ্নে বুঝি সচকিত হন ডাক্তার। বলেন, দেখুন অ্যাজ এ ম্যান আই হ্যাভ দি গ্রেটেস্ট রিগার্ড ফর হিম—মানুষ হিসেবে তাঁর প্রতি আমার রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা।

এও এক বিড়ম্বনা। মনপ্রাণ দিয়েও মুখে স্বীকার করতে লজ্জা। সব দিয়েও উপেক্ষার অভিনয়। মৌখিক অস্বীকৃতির মধ্যে স্বীকৃতির চরম প্রকাশ।

তাই তো মাস্টারমশাই মহেন্দ্র গুপ্ত তখন জানতে চাইলেন, আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে? তখন ডাক্তার যেন হতাশার প্রতিমূর্তি—সে মূর্তি আবার আনন্দঘন। বললেন, বন্দোবস্ত আমার মাথা আর মুণ্ডু। আবার যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত।

আপনি তাঁকে অনুগ্রহ করে অনেক দেখছেন।

অনুগ্রহ!

আমাদের ওপর, পরমহংসদেবের ওপর বলছি না।

সেকথায় ডাক্তার যেন বিষাদমূর্তি। একটু চুপ করে তিনি বলেন, তা নয় হে, তোমরা জান না আমার অ্যাকচুয়াল লস হচ্ছে। রোজ রোজ দুতিনটে কলে যেতেই পারি না। তার পরদিন সে সব রোগী দেখতে যাই। নিজের থেকেই যাই—তাই আর ফি নিতে পারি না।

তা, আপনিই তো ঠাকুরকে কথা বলতে একদম বারণ করেছেন। নিজে ছ'সাত ঘণ্টা ধরে বকেন কেন তাঁর সঙ্গে। আর পাঁচটা রোগীর মত দেখে চলে এলেই হয়।

আরে বাপু, বকি কি আর সাধে? থাকি কি এমনি এমনি। আনন্দ! আনন্দ পাই যে ওঁর সঙ্গে কথা বলে।

একই কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন গিরিশ ঘোষ। আপনি এখানে তিনচার ঘণ্টা রয়েছেন, কই রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না?

আর ডাক্তারি, আর রোগী। যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল।

এ কি হতাশা? আক্ষেপ, ঐহিক সম্পদ হারানোর দুঃখ? তাই বা কেমন করে বলি? এ তো শূন্য কলসীর চ্যাপ চ্যাপ আওয়াজ নয়, এ যে পূর্ণকুম্ভের জলদগম্ভীর স্বর।

ডাক্তারের কথা শুনে পরমহংসদেব তাই যখন বললেন, দেখ কর্মনাশা বলে একটা নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। ডুব দিলে কর্মনাশ

হয়ে যায়—সে আর কোন কাজ করতে পারে না।

সে কথায় হাসেন ডাক্তার। উদাস, খিন্ন হাসি। কই—এখনও তো আমার তা হ'ল না? এখনও তো আমি সেই ঘাটেও নয়, পারেও নয়—এখনও যে আমি সেই মাঝখানে। যেন ধোবি কা কুত্তা, না ঘরকা, না ঘাটকা।

মাস্টার, গিরিশবাবু—তোমরা সবাই শোন, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর তাহলে নয়। কিন্তু আপনার লোক বলে যদি মনে কর, তাহলে আমি তোমাদেরই—তোমাদেরই রইলুম।

.৮৮৫। সেপ্টেম্বরের শেষ।

ততদিনে ডাক্তাররা প্রায় নিশ্চিত, ঠাকুরের গলার ওই ব্যথা অন্য কিছু নয়—ক্যান্সার—কর্কট রোগ। নিদান হেঁকে গেছেন গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি কবিরাজের দল। ভক্তরা আকুল, কিন্তু যাঁকে নিয়ে সবার এত উদ্বেগ, এত ভাবনা—সেই ঠাকুরটি পরম নিশ্চিন্ত। সুতীব্র যন্ত্রণার মুখেও স্থির, শান্ত, পরমানন্দে মগ্ন।

বলরাম বসুর বাড়িতে রয়েছেন ঠাকুর। ইদানীং তো প্রায়ই তিনি আসতেন, রাত্রিবাসও করতেন। কিন্তু এবারের আসাটা যেন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন বেশে—ভিন্ন রূপে।

গৃহী সাধক বলরাম বসু তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে নিজের গৃহমন্দিরে পেয়ে ধন্য—কৃতকৃতার্থ। প্রাণভরে সঙ্গ করতে চান তিনি ঠাকুরের, হৃদয় নিংড়ে করতে চান সেবা। কিন্তু অবসর কোথায়?

গৃহে তখন মোহনামুখি স্রোত। ভিড় আর ভিড়। অবিরাম জনস্রোত। ঠাকুর তো এর আগেও এসেছেন এ গৃহে—থেকেছেন। তখনও মানুষ এসেছে। কিন্তু না, এবারের মত নয়। এ যেন বাঁধভাঙা জনস্রোত।

বলরামবাবুকে ব্যস্ত থাকতে হয় এই মানুষজন নিয়ে, ঠাকুর আর তাঁর ভক্তদের বন্দোবস্ত করতে। তাই মনের সাধ থাকে মনেই। গৃহস্বামী হয়েও বলরামবাবু প্রায়ই গৃহছাড়া। দূর থেকে স্মরণে মননেই চলে তাঁর ঠাকুরসেবা।

ওদিকে ঠাকুর—পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ—চিকিৎসকরা যাঁকে বলেছেন নীরব থাকতে—তিনি যে এখন আগের চেয়েও মুখর—সরব। কাছের—দূরের—যে

আসছে তাকেই তিনি উজাড় করে দিতে চাইছেন। যেন জোর গলায় বলছেন, কে আছো পাপী, কে আছো তাপী, কে আছো অভাবী—কে তুমি জিজ্ঞাসু—এসো—এসো নিয়ে যাও তোমাদের অমৃত—জানো সেই অমৃতকে—ভরে নাও হৃদয়। সব সমস্যার কর সমাধান।

ডাক্তাররা বলেন, দেখুন এত কথা বললে তো আরাম পাবেন না—এতে বিস্তার হবে ব্যাধির। এবার আপনি চুপ করুন।

হাসেন ঠাকুর, চুপই তো করবো। তাই তো এত কথা। যাবার আগে ত্রিতাপদগ্ধ পৃথিবীকে জানিয়ে যাই শান্ত থাকার, অমৃতকে পাবার সাধনার কথা—নিজের ভাবে বিভোর থাকার—চুপ থাকার কথা। ওগো সকলকে চুপ করাব জন্যই যে আমার এবারের আসা। সেই আসার আশ্বাসকে সার্থক করতেই যে আমার এত কথা। সেই কথা শেষ করেই করব চুপ।

আকুল আর্তি অন্তরঙ্গ ভক্তকণ্ঠে, প্রভু আমার—ঠাকুর আমার—তোমার মধ্যেই যে আমাদের শান্তি—তোমাতেই আমাদের ধর্ম, মোক্ষ—সব। তোমার কণ্ঠের সুরধারায় ভেসে গেছে আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা। কিন্তু আজ কণ্ঠ যখন তোমার প্রায় রুদ্ধ—যন্ত্রণার নীল বিষে যখন তুমি নীলকণ্ঠ—তখন আমরা তোমাকে দিতে পারছি না এতটুকু শীতলতা—এতটুকু শান্তি। তুমি শুধু দিয়েই গেলে—আমরা যে তেমন করে দিতে পারলাম না তোমাকে ভক্তি বিশ্বাসও। আজ এই যন্ত্রণার মুহূর্তে তাই তো প্রার্থনা—একটু থামো। একটুখানি নীরব থেকে আরো বহু বহু দিন আমাদের তোমার এই কথামৃত পান করতে দাও ঠাকুর।

ঠাকুরের মুখে সেই অমৃতহাসি। এবার তো নিতে আসিনি—এসেছি শুধু দিতেই। তোমাদেরই জন্য যে এই দেহধারণ। তোমরা যখনই বলবে—চাইবে—সেই মুহূর্তে এই জীর্ণ খোলস ছেড়ে আমি পাড়ি দেব অনন্তে—মিলব সেই পরমসঙ্গে। যতক্ষণ আছি—ততক্ষণ আমাকে বলতে দাও—বঞ্চনা কোর না ওদের। ওদের শুনতে দাও।

নির্দেশ, অনুরোধ, আর্তি সবই ফিরে আসে ঠাকুরের হাসির দুর্গে ঘা খেয়ে। তিনি যেমন ছিলেন, থাকেন তেমনই। কথায় অনর্গল। ভোর থেকে দুপুর আবার খাওয়াদাওয়ার পর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম তারপর আবার সেই রাতের খাওয়া এবং ঘুমনো পর্যন্ত বিতরিত হতে থাকে কৃপাধারা।

মাত্র সাতটি দিন। তারই মধ্যে বহুজনের ব্যক্তিজীবনের জটিল প্রশ্নের হ'ল

সমাধান, ঈশ্বরীয় কথা ও আলোচনায় বহু মানুষের মন হ'ল অধ্যাত্মিক পথগামী। ভজনসঙ্গীত শ্রবণের মধ্য দিয়ে ঘনঘন গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়ে বহুজনের হৃদয় করলেন শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে উচ্ছ্বসিত।

ভক্তলেখনীতে সেদিনের একটি ছবি। তখন বিকেল। বলরামবাবুর দোতলার বড় ঘরটি তখন লোকে ভর্তি। ঠাকুর বসে আছেন একদিকে। প্রসন্ন আনন—আনন্দদীপ্ত। দক্ষিণ চরণ উত্থিত—প্রসারিত। একজন সেই চরণ আপন বক্ষে ধারণ করে নিমীলিত নয়নে—অবিরত অশ্রুধারায় সিক্ত করছেন বদনমণ্ডল। চারিদিকে এক দিব্য নিস্তব্ধতা। তারই মধ্যে গান ধরেছেন মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর কালীপদ ঘোষ—

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,
আমায় ধর নিতাই।
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়া যাই।
(নিতাই) যত লিখেছি আপন হাতে
অষ্টসখী সাক্ষী তাতে
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হ'ল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

শেষ হ'ল গান। কিন্তু গানের রেশ তখনও যেন গমগম করছে—'প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।' একসময় প্রায় বাহ্যভূমিতে ফিরে এলেন ঠাকুর। সেই অবস্থাতেই সামনের সেই লোকটিকে তিনি বললেন, 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' বারবার তিনবার তিনি বললেন 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' তাঁরই সঙ্গে মিলিয়ে সেই ব্যক্তিও বললেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। স্বভূমে ফিরে এলেন ঠাকুর।

সেদিনের সেই কৃপাধন্য ব্যক্তিটির নাম নৃত্যগোপাল গোস্বামী। ঢাকার একটি কলেজের তিনি অধ্যাপক। ঠাকুরের ব্যাধির সংবাদ পেয়েই ছুটে এসেছেন তিনি কলকাতায়। তাঁর সেই আকুলতায়ই বুঝি ঠাকুর হলেন কৃপাপরবশ—দিলেন তাঁকে মহামন্ত্র—ভক্তগণ দেখলেন এক মহাদৃশ্য।

বলরামভবনে ঠাকুরের এই এক সপ্তাহ অবস্থানকালে এমনি কত দৃশ্যেরই না হয়েছে অভিনয়। লীলাময় ঠাকুর মেতেছেন এমনি কত লীলায়—মাতিয়েছেন কত অজস্রজনকে।

মহেন্দ্রবাবু কি টাকা টাকা করছ। মাগ মাগ। মান, মান করছ। ওসব এখন ছেড়ে দিয়ে একচিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। ওই আনন্দ ভোগ কর।

ঠাকুর কথাগুলো বলে চলেছেন মহেন্দ্র সরকারকে। শ্যামপুকুর-বাটীতে ডাক্তার এসেছিলেন ঠাকুরের গলরোগের চিকিৎসা করতে। কিন্তু চিকিৎসা করতে এসে এখন তিনি নিত্যই হচ্ছেন চিকিৎসিত। ভবরোগের বৈদ্য যিনি তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছেন ওষুধ।

ডাক্তার সরকার বিজ্ঞানী মানুষ। প্রমাণ ছাড়া মানতে চান না কিছুই। অন্তরে তাঁর রয়েছে ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা—কিন্তু বিজ্ঞানের তত্ত্বে মেলে না যা তাকে স্বীকার করতে তাঁর বিরাট দ্বিধা।

তাঁর ভাব দেখে ঠাকুর শোনান একটি গল্প। একজন এসে বললে, ওহে পাড়াতে দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে।

এখন যাকে খবরটা দেওয়া হ'ল সে আবার ইংরেজি লেখাপড়া জানা লোক। সে বললে, দাঁড়াও—দাঁড়াও। একবার খপরের কাগজখানা দেখি।

কাগজখানা টেনে নিয়ে বেশ ভাল করে সব পাতায় খোঁজে সে খবর। তারপর তা দেখতে না পেয়ে বলে, ওহে তোমার কথা তো বিশ্বাস করতে পারছি নে। কই, কাগজে তো সে খপর কিছু নেই। তোমার ওই বাড়ি ভাঙার কথা সব মিছে।

আসল ব্যাপারটা কি জান, সরল না হলে চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূরে। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই আসে নানা সংশয়, নানা অহঙ্কার। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার এইসব আর কি।

মূল কিন্তু হ'ল বিশ্বাস। বিশ্বাস যত বাড়বে—জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে খায়, সে ছিরিক ছিরিক করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাকপাতা, খোসা, ভুষি যা দাও গব্‌গব্ করে খায় সে গরু হুড় হুড় করে দুধ দেয়।

ডাক্তার সরকার কিন্তু কথাটা শুনে বলেন, না, না—গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে দুধ হওয়া ভাল না।

কেন? কেন? জিজ্ঞেস করেন ঈশান মুখার্জি, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি।

আমার নিজেরই একটা ঘটনার কথা বলি, শোন। আমার একটা গরুকে অমনি সব যা তা খেতে দিত। সেই গরুর দুধ খেয়ে শেষে আমার হ'ল ভারি ব্যারাম। তখন ভাবলুম—তাই তো ব্যাবামটা হ'ল কি থেকে? শেষে একদিন দেখলুম চাকরটা ওই গরুকে কতকগুলো মাষকলাই—আরো সব কি কি যেন দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলুম, কোথা থেকে যেন কয়েকমণ মাষকলাই পাওয়া গিয়েছিল, সর্দির ভয়ে কেউ খায়নি, তাই গরুকে খাওয়াচ্ছে। হিসেব করে দেখলুম ওইসময় থেকে এই সর্দি কাশি। ওষুধটষুধ খেয়ে শেষে হাওয়া বদলাতে গেলাম লখনউ। হাজার বার টাকা খরচ হয়ে গেল ওই জন্য।

ডাক্তারের কথা শুনে হেসে ওঠে সবাই। ডাক্তার কিন্তু বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, না, না হাসির কথা নয়, কি থেকে যে কি হয় তার কিছুই বলা যায় না। সেবার পাক পাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত আট মাসের একটি মেয়ের ভারি অসুখ—সবসময় শুধু খুস খুস করে কাশে। কাশতে কাশতে দম একদম বন্ধ হয়ে আসে। বুঝলুম মেয়েটির হয়েছে হুপিং কাশি—তোমরা যাকে বল ঘুঙরি কাশি। আমায় নিয়ে গিয়েছিল দেখাতে। কিছুতেই আর অসুখের কারণ ধরতে পারি না। শেষে জানতে পারলুম, যে গাধার দুধ মেয়েটি খেত—সেই গাধা বৃষ্টিতে ভিজেছিল—তাতেই এই বিপত্তি।

সে গল্প শুনে সবার হাসির মধ্যে ঠাকুর বলে উঠলেন, সে কি গো, এ যে সেই তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গেছিলো—তাই আমার অম্বল হয়েছে।

তা বলতে পারেন। জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তাররা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা বা ব্লিস্টার লাগিয়ে দিল—ব্যস—তাতেই বিলকুল ঠিক।

শ্যামপুকুরে ডাক্তারের চিকিৎসায় ঠাকুর কখনও একটু ভাল থাকেন আবার কখনও বা অবস্থা হয় একটু খারাপ। সেদিন কি জানি ঠাকুরের অবস্থার একটু অবনতি হ'ল।

ডাক্তার এলেন। সব খোঁজ নিয়ে বললেন, ওষুধ যা দিচ্ছি তাতে খারাপ হওয়ার কিছু নেই। কেন খারাপ হ'ল বলতো?

ঠাকুর বলেন, কি জানি বাপু কোনটাকে যে তোমরা ভাল বল আর কোনটাকে খারাপ তা আমি বুঝি না।

ডাক্তার কিন্তু ঘন ঘন মাথা নাড়েন আর বলেন, না—নিশ্চয়ই কোন গোল-মাল হয়েছে।

সেবকরা বলে, হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি—কষ্টটা যে আজ ওঁর বড্ড বেশি।

সে তো দেখছিই। কিন্তু কেন?

হেসে বলেন ঠাকুর, সে তো তুমি বলবে গো। তুমি ডাক্তার, দেখ তোমার বিজ্ঞান কি বলে।

বলবে মাথা আর মুণ্ডু। তুমি পরমহংস আমায় আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলছ। আমার সব কিছু গুলিয়ে দিচ্ছ তুমি।

ডাক্তারের সে কথায় ঠাকুরের মুখে সেই দিব্য হাসি—যে হাসি হরণ করে তাপ—জীবনে দেয় শান্তি—কর্মে অনুপ্রেরণা—ধর্মে আনে মতি।

ডাক্তার অনেক ভেবে চিন্তে বলেন, নিশ্চয়ই তোমার খাওয়ায় কোন অনিময় হয়েছে। নিশ্চয়ই কুপথ্য করেছ?

মাইরি বলছি, না তুমি যেমন বলছ তেমনি খাচ্ছি।

তাই যদি খাবে—তবে এমন হ'ল কেন?

নিরীহ মুখে বলেন, কি জানি বাপু তুমিই খুঁজে দেখ।

দেখবই তো। জোর করেই বলেন ডাক্তার সরকার।

বলতো কাল কি খেয়েছিলে?

যেমন খাই, সকালে একটু ভাতের মণ্ড, ঝোল আর রুটি। সন্ধ্যায় একটু দুধ আর যবের মণ্ড।

না, এতো আমিই বলেছি।

তবে?

তবু নিশ্চয়ই কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। আচ্ছা বল তো কোন কোন আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধা হয়েছিল?

কেন, আলু, কাঁচকলা, বেগুন আর দুএক টুকরো ফুলকপিও ছিল।

এঁ্যা, ফুলকপি খেয়েছ? এতো খাবার অত্যাচার হয়েছে, ফুলকপি ভীষণ গরম ও দুষ্পাচ্য। ক' টুকরো খেয়েছ?

এক টুকরোও খাইনি, তবে ঝোলে ছিল দেখেছি।

খাও আর নাই খাও, ঝোলে ওর সত্ব তো ছিল—সেইজন্যই তোমার হজমে ব্যাঘাত হয়ে আজ ব্যারামের বৃদ্ধি হয়েছে।

সে কি গো ? কপি খেলাম না, পেটের অসুখও হয়নি, ঝোলে একটু কপির রস ছিল বলে ব্যারাম বেড়েছে একথা তো আদৌ মানতে পারছিনে বাপু।

ডাক্তার বলেন, ওইরকম একটুকুতেই কতটা অপকার করতে পারে তা তোমার ধারণা আছে ? বলিনি তোমায় মাষকলাই খাওয়া গরুর দুধ খেয়ে কি ফ্যাসাদে পড়েছিলাম আমি।

ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেন, বলবে না কেন। সেই যে তোমার তেঁতুল-তলা দিয়ে গিয়েছিল গাড়ি তাতেই সর্দি হাঁচি।

ঠাকুরের বলার ধরনে হেসে উঠলেন সবাই।

এমনি ভাবে চিকিৎসা চলে ডাক্তার সরকারের। যত দিন যায় ঠাকুরের প্রতি ডাক্তারের শ্রদ্ধা, ভালবাসা যেন বাড়তে থাকে। শুধু ঠাকুর কেন, তাঁর ভক্তদের প্রতিও দেখা দেয় তাঁর ভালবাসা। তিনি বুঝতে পারেন, নিছক হুজুক নয়, ঠাকুরকে ওরা সত্যি সত্যি ভালবাসে—ভক্তি করে তাই এত করে। একটা কথা কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন না, একটা ভাল—সৎ মানুষকে ওরা অমন অবতার অবতার করে কেন ?

কেনর উত্তরটা বড় সহজে পান না ডাক্তার। বহুদিনই কথায় কথায় উঠেছে অবতারের কথা। ঠাকুর বলেছেন মাস্টারমশাইকে, দেখ ডাক্তারকে তুমি বলবে —আমি অবতারের কথা বলেছি। বলবে অবতার—যিনি তারণ করেন। তা দশ অবতার আছে চব্বিশ অবতার আছে আবার অসংখ্য অবতার আছে।

পরে একদিন ডাক্তারকে বললেন তিনি, তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তা বেশ না মানলে। সাকার আর নিরাকার—ঈশ্বরে তো মন আছে। যার ঈশ্বরে মন সেই তো মানুষ। মানুষ আর মানহুঁশ। যার হুঁশ আছে চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য- সেই মানহুশ। তা অবতার মানে না, তাতে দোষ কি ?

এই যে সব জীব-জগৎ দেখছ—এ সবই ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের প্রকাশ। যেমন বড়-মানুষ আর তার বাগান—এটুকু মানলেই হ'ল।

এই সহজ সরল কথায় ডাক্তার মুগ্ধ। ঠাকুর কিন্তু বলে যান। দেখ—তিনি সর্বত্র সবার মধ্যে আছেন, কিন্তু যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ—সেখানেই অবতার—এই আমার মত।

ডাক্তার কিন্তু বলেন, অবতার আবার কি? যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব? হ্যাঁ তবে রিফ্লেকসন অব গডস—ঈশ্বরের জ্যোতি মানুষে প্রকাশ হয়ে থাকে তা মানি।

ডাক্তারের সেকথা শুনে গিরিশচন্দ্র বলেন, অবতার মানেন না, কিন্তু আপনিও তো গডস লাইট—ঈশ্বরের জ্যোতি দেখেননি—তবে?

ডাক্তার একথার উত্তর দিতে একটু থতমত খান তারপর যেন তর্ক চালিয়ে যাবার জন্যই একটু জোর দিয়ে বলেন, আপনিও তো প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখেননি।

একথায় গিরিশচন্দ্র কিন্তু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েন—যেন এক ভাবের ঘোরে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—আই সি ইট। আই সি দি লাইট। শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার প্রুভ করব—তা না হলে জিব কেটে ফেলব।

গিরিশের ওই ভাব দেখে ঠাকুর বলেন, এসব যা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়। এসব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগী বলেছিল, এক জালা জল খাব, এক হাঁড়ি ভাত খাব। সেকথা শুনে বদ্যি বলেছিল, বেশ তো খাবি। পথ্য পেয়ে বলবি তাই করা যাবে—এখন ওষুধ তো খা।

দেখ যতক্ষণ কাঁচা ঘি—ততক্ষণই কলকলানি। পাকা হলে আর শব্দ থাকে না। যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইভাবে দেখে। আমি দেখেছি বড়মানুষের বাড়ির ছবি—বুইনের ছবি—এইসব, আবার ভক্তের বাড়ি থাকে ঠাকুর দেবতার ছবি।

রামচন্দ্র বলেছিলেন লক্ষ্মণকে, ভাই যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার আলোবোধ আছে তার অন্ধকারবোধও আছে। তাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষ রূপে জানলে সেই অবস্থা হয়—এরই নাম বিজ্ঞান।

তবে জানো তো, পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হয়ে যায়।

একথায় ডাক্তার বলে ওঠেন, পূর্ণজ্ঞান থাকে কই? সব ঈশ্বর, তবে তুমি পরমহংসগিরি করছ কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা করছে কেন? চুপ করে থাক না কেন?

হেসে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, দেখ, জল স্থির থাকলেও জল আবার হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।

কথা বলতে শুরু করলে হুঁশ থাকে না ঠাকুরের। ডাক্তার যখন স্ব-ভাবে

থাকেন তখন মাঝে মাঝেই দেন হুঁশিয়ারি—না না অত কথা ভাল নয়। কথা বললে রোগ বাড়বে।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে। ডাক্তার নিজেই এখন রুগ্ন। ঠাকুরের কথামৃত পান করার জন্য সব সময় তাঁর মন এত চঞ্চল থাকে। তাঁর নিজের বলতে কাজ আর এখন প্রায় নেই বললেই চলে। রোগীর চিন্তা, হোমিওপ্যাথিকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার চিন্তা, নতুন আবিষ্কারের চিন্তা সব এখন শিকেয় উঠেছে। এখন শুধু নিজেকে জানার—পরমকে উপলব্ধি করার—ঠাকুরবাটীতে আরো বেশি করে লীন হয়ে যাবার চেষ্টা। মুখে কিন্তু ডাক্তার ভাবটি দেখান, তিনি কিছু মানেন না—তিনি বিজ্ঞানী। এখানে যেসব কথা হয় তা অজ্ঞানের কথা। তবু আসা তাঁর বন্ধ হয় না, শেষ হয় না কথামৃত পানের পিপাসা।

দেখ, বিশ্বাস যদি করতে হয় তো পুরো বিশ্বাস করবে। আধখানা জিনিস ভাল নয়। তাতে এ ও যায়, ও-ও যায়। মাঝখান থেকে পাগলা হাতি শুঁড় পাকিয়ে তুলে আছাড দেয়।

ব্যাপারটা কি রকম জানো। এক গুরু তাঁর শিষ্যকে বললেন, দেখ বাবা সর্বভূতে রয়েছেন নারায়ণ। তোমার মধ্যে যিনি আছেন ওই কীটটির মধ্যেও রয়েছেন তিনিই।

কথাটা শিষ্যের মনে ধরে। সব কিছুর মধ্যেই নারায়ণ দেখার একটা আনন্দে মজে থাকে সে। একদিন বনের মধ্য দিয়ে চলেছে শিষ্যটি। হঠাৎ সামনে দেখা গেল এক পাগলা হাতি আসছে। হাতির পিঠ থেকে মাহুত চেঁচাচ্ছে, সরে যাও, সরে যাও। এ হাতি ক্ষেপে গেছে।

মাহুতের কথা শুনে শিষ্যটির সঙ্গে যারা ছিল তারা সরে যায় নিরাপদ জায়গায়। শিষ্যটি কিন্তু যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। শিষ্যটি তখন মনে মনে বিচার করছে—ওই হাতির মধ্যেও রয়েছে নারায়ণ—আমার মধ্যেও রয়েছে নারায়ণ, তাহলে আর ভয় কিসের? মাহুতের কথা না শুনে দাঁড়িয়েই থাকে শিষ্যটি।

শিষ্যের এই বেয়াদপি কিন্তু হাতির না-বরদাস্ত। সে শিষ্যটিকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে মারল এক আছাড়। তারপর আবার চলতে থাকল সামনে।

হাতিটি চলে যাবার পর সবাই মিলে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে শিষ্যটিকে নিয়ে এল গুরুর কাছে। গুরু সব শুনে ধমক দিলেন শিষ্যকে, কেমন আহাম্মক হে তুমি। হাতি আসছে দেখেও পথ থেকে সরে দাঁড়ালে না?

শিষ্যটি মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, কেন গুরুদেব, আপনিই তো বলে দিয়েছিলেন সর্বভূতে রয়েছেন নারায়ণ। হাতির মধ্যে যে নারায়ণ রয়েছেন তিনি কেন ক্ষতি করবেন আমার মধ্যে যে নারায়ণ রয়েছেন তাঁর?

শিষ্যের জিজ্ঞাসায় চটে গিয়ে গুরু বলেন, ওরে মুখ্যু, মাহুতের মধ্যে যে নারায়ণ রয়েছেন তিনি যে তোকে বারবার সরে যেতে বললেন, তা শুনলি না কেন?

কথাটা হ'ল তাই বিশ্বাসটা যেন থাকে পুর্ণমাত্রায়। জেন, তিনিই শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি হয়ে আছেন ভিতরে। তাই কথা শুনবে সবারই তারপর তোমার মধ্যে যে শুদ্ধবুদ্ধি ও মন আছে তাকে দেবে বিচার করতে—পাবে পথ। তিনিই করবেন যা করবার।

একটা কথা মনে রাখবে সব সময়, তিনি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র। তুমি ঘর, তিনি ঘরনী। তিনি বাজান, তুমি বাজ। তিনিই মাহুত নারায়ণ। সে নারায়ণকে তাই তোমার মানতেই হবে।

ঠাকুরের কথার পিঠে কথা বলে তাঁকে দিয়ে আরো কথা বলাতে কোন ক্লান্তি নেই ডাক্তারের। সব ধন্ধ ঘোচার পরও তাই নেই তাঁর প্রশ্নের বিরাম। জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসার খড়্গ তিনি উঁচিয়েই আছেন সব সময়। তাই ঠাকুরের কথা শেষ হতে বললেন, সবই বুঝলুম। এতই যদি নির্ভরতা, তবে কেন বল, এটা সারিয়ে দাও?

ডাক্তারের প্রশ্ন শুনে একটু হেসেই বলেন ঠাকুর, ব্যাপারটা কি জান, আমি ঘটটা রয়েছে যে। ওটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এমনটাই হবে।

মনে করো মহাসমুদ্র। ওপর, নিচ, পাশ চারধারে তার শুধু জল আর জল। সেই জলের মধ্যে রয়েছে একটি ঘট। দেখ ঘটের ভেতরে জল, বাইরেও জল। তবু ওই ভেতর আর বাইরের জল মিলেমিশে এক হচ্ছে না। হবে কি করে? মাঝখানে ওই ঘটটা রয়েছে না। ওইটি যতক্ষণ না ভাঙা হচ্ছে ততক্ষণ সব কিছু একাকার হবে না। এই আমি ঘটটা রেখে দিয়েছেন তিনিই—তাঁর ইচ্ছেতে হচ্ছে এসব।

সে কথায় ডাক্তার যেন হ'ল আরো উত্তেজিত। তিনি বলেন, তাহলে তুমি 'আমি' এতক্ষণ ধরে যা বলছ তার মানেটা কি? তাহলে ঈশ্বর কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন?

ব্যাপারটা একটু উসকে দেওয়ার জন্যই গিরিশচন্দ্র ডাক্তারকে বলেন, মশাই ব্যাপারটা যে চালাকি নয় বুঝলেন কেমন করে?

ঠাকুর হেসে বললেন, দেখ, এক রাজার চার ছেলে। তারা খেলছে একসঙ্গে। কেউ সেজেছে রাজপুত্র, কেউ মন্ত্রিপুত্র, কেউবা কোটালপুত্র। আদতে তারা সবাই রাজপুত্র কিন্তু খেলছে এক একরকম সেজে। তা ভগবানেরও এইটি হচ্ছে খেলা—লীলাখেলা। এই 'আমি টুকু' তাই তিনিই রেখে দিয়েছেন।

ডাক্তার ঠাকুরকে দু'টি গুলি দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার আজকের ওষুধ—পুরুষ আর প্রকৃতি। ডাক্তারের উপমায় হেসে উঠলেন সবাই।

চিকিৎসা চলছে। কখনও কখনও মনে হয় রোগ বুঝি সেরে গেল। পরক্ষণেই দেখা যায় রোগ বাঁক নিয়েছে খুব খারাপ দিকে। ভক্তরা বিচলিত। বুঝতে পারেন না—একি তবে ঠাকুরের বিদায় নেবার ইঙ্গিত। তাই তিনি হয়েছেন এমন অকাতর। বলছেন, ওরে আয়—আয়। কে নিবি নিয়ে যা, দিয়ে আমি ফকির হয়ে যাই। ভক্তের দল ভাবেন আর ঠাকুরের কাছে যখন পারেন তখনই আসেন।

ঠাকুরের অসুখের কথাটা কানে এসেছে বিনোদিনীরও। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সম্রাজ্ঞী তিনি। অভিনয়ে মন মাতিয়েছেন সবার। অভিনেত্রী হিসেবে অনেকেরই হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু সমাজে? না সেখানে তিনি অচ্ছ্যুৎ—তিনি যে নটী।

সবাই যখন মুখ ফিরিয়ে ছিল সেই সময় এই নটীকে যিনি কৃপা করেছিলেন—তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিনোদিনী আপন ঘরে বসে ভাবেন শুধু সেদিনের কথা। তাঁর আঁধার ঘরে আলোর প্রদীপ জেলেছিলেন যিনি আজ তিনি অসুস্থ—তাঁর ওই যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁর কাছে যেতে না পারার -তাঁর এতটুকু সেবা করতে না পারার দুঃখটা কাঁটার মত বিঁধছে। অথচ তিনি যেতে পারছেন না সেখানে। সমাজের ভ্রূকুটির সামনে তিনি যে বড় অসহায়। কেমন করে সেবা করবেন তিনি তাঁর প্রাণের দেবতাকে? তিনি যে নটী--। কলালক্ষ্মীর পায়ের তলায় যত শতদল হয়েই ফুটে উঠুন না কেন, তাঁর জন্ম যে পাঁকে?

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আপন মনে আপন ঘরে চোখের জল ফেলেন বিনোদিনী আর প্রার্থনা করেন চৈতন্যদাতা ওই ঠাকুরেরই পায়—ঠাকুর তুমি

এবার ভাল হয়ে যাও। বলেন, ঠাকুরগো, একবার তোমার কাছে যাবার—তোমাকে দেখার সুযোগ করে দাও আমাকে। জগৎ যদি আমাকে ঘৃণার চোখে দেখে দেখুক, কিন্তু তুমি তো আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দিয়েছো, তাতে আমি ধন্য।

চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে বিনোদিনীর মনে পড়ে সেদিনের কথা। স্টার থিয়েটারে তখন গিরিশবাবুর পরিচালনায় 'চৈতন্যলীলা' হচ্ছে। নিমাই সেজেছেন তিনিই। আর অভিনেত্রী জীবনের সে এক স্বর্ণময় অধ্যায়। অভিনয় করতে করতে ভাবে ভাবে বিভোর হয়ে মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারান তিনি। কত বৈষ্ণব চূড়ামণি পর্যন্ত তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ। নিজেরা মঞ্চে এসে আশীর্বাদ জানিয়েছেন তাঁকে আর তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপার কথা মনে করে শুধু কেঁদেছেন।

সেদিন অভিনয় করতে এসেই শুনলেন, আজ দর্শকদের মধ্যে থাকবেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরের সেই ঠাকুর যাঁর আশ্রয় নিয়ে গিরিশচন্দ্র হয়েছেন ভক্তভৈরব। সেই ঠাকুর দেখবেন তাঁর মত এক নগণ্য নটীর অভিনয়, ভাবতেই বিনোদিনীর বুকটা ওঠে কেঁপে, আবার ভরে ওঠে গর্বে—আশায়ও। এবার বুঝি কৃপা পাবেন তিনি কৃপাবতারের।

অভিনয় শেষ হ'ল। বিনোদিনী শুনলেন, ঠাকুর এসেছেন অফিসঘরে। সবার পিছু পিছু বিনোদিনী গেলেন সেখানে। দূর থেকে একটু দেখা—একটা প্রণাম জানানো তাঁর পায়— এইটুকু শুধু তাঁর প্রার্থনা—কামনা।

অফিসঘরে ঢুকতেই গিরিশ ঘোষ বললেন, আয় বিনোদ, এগিয়ে আয়। তারপর তাঁকে দেখিয়ে ঠাকুরকে বললেন, এই যে এসেছে আপনার শ্রীচৈতন্য।

কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। 'হরি গুরু, গুরু হরি', 'হরি গুরু, গুরু হরি' নামে তিনি নাচতে লাগলেন, আহা! অপূর্ব তাঁর নৃত্য—কি মধুঝরা তাঁর কণ্ঠ। সে কণ্ঠ শুনলে ধন্য হয়ে যায় জীবন।

একসময় নৃত্য থামিয়ে ঠাকুর এগিয়ে এলেন বিনোদিনীর কাছে। তারপর বিনোদিনীর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'মা, তোমার চৈতন্য হোক।'

সেদিনের সে করুণা—সে যে বিনোদিনীর সারাজীবনের সঞ্চয়। সেই মুহূর্তটিকে কি ভোলা যায় কোন ভাবে? বিনোদিনী নিজেই বলেছেন, 'তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণার দৃষ্টি। পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়ে-

ছিলেন। হায়! আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী। আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আমার মোহ জড়িত হইয়া জীবনকে নরক সদৃশ করিয়াছি।'

আর আজ সবার যন্ত্রণার বিষ নিজে গ্রহণ করে তিনি নিজে যখন যন্ত্রণাবিদ্ধ তখন শুধুমাত্র নীচকুলে জন্ম নেবার অপরাধে তাঁর কাছে যেতে পারছেন না, তাঁর চরণ স্পর্শ করতে পারছেন না ভেবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তিনি। কতজনকে বলেছেন, কিন্তু সবাই বলেছেন, ওই এক কথা, না—না অসম্ভব। শ্যামপুকুরে ওই বাড়িতে গিয়ে ঠাকুরের দেখা পাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

এমন সময় দেখা হ'ল তাঁর কালীপদ ঘোষের সঙ্গে। 'ডিকসন' কোম্পানীর চাকুরে কালীপদ ঘোষ গিরিশচন্দ্রেরই প্রতিবেশী। সব বিষয়েই দুজনের অদ্ভুত মিল। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মদ খেয়ে তিনিও হতেন তাঁর মও মত্ত।

দুই ঘোষ গিরিশচন্দ্র আর কালীপদ যখন মত্ত অবস্থায় রাস্তায় বেরোতেন তখন লোকে তাঁদের বলত জগাই মাধাই। গিরিশচন্দ্রের মতই কালীপদও প্রথম দর্শনেই ঠাকুরকে মানেননি, এমনকি প্রণাম পর্যন্ত করেননি।

কালীপদর নাস্তিকতা, ঠাকুরের প্রতি তাঁর এই উপেক্ষা, অবিশ্বাস পীড়া দিত তাঁর স্ত্রীকে। তিনি কেঁদে পড়লেন ঠাকুরের পায়, ওঁর কি হবে? ওঁকে আপনি উদ্ধার করুন।

সেকথা শুনে হেসে বলেছিলেন ঠাকুর, ও যাবে কোথায়? ও যে এখানকার।

সত্যিই তাই হ'ল। বদলে গেলেন কালীপদ। ঠাকুরকে তিনি মনেপ্রাণে মানলেন যুগবাবতার বলে। অকাতরে দান করে বিবেকানন্দের কাছ থেকে পেলেন নতুন নাম 'দানা কালী'।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে কালীপদও প্রায়ই আসতেন থিয়েটারে। গিরিশচন্দ্রের বন্ধু বলে সবাই খাতির করত তাঁকে। আর সেই সূত্রেই বিনোদিনীর সঙ্গেও ছিল তাঁর পরিচয়।

সেদিন সেই কালীপদকে পেয়ে ধরে বসলেন বিনোদিনী—আমাকে একবার ঠাকুর দর্শন করান।

গিরিশচন্দ্রর মত কালীপদও মনে করেন ঠাকুর যুগাবতার। তাই তাঁর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা তিনি মানতেন না। বিনোদিনীর কথা শুনে সেকারণেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বেশ তো যেয়ো।

বিনোদিনী বলেন, কিন্তু ওখানে যে নতুন কাউকে যেতে দেয় না। বলে ওঁর চরণ স্পর্শ করলে হবে ওঁর রোগ বৃদ্ধি।

হ্যাঁ, সবাইকে যেতে দেয় না শুনেছি। শুনেছি পুরনো কারো চাপরাশ না পেলে নতুন কাউকে ওরা ঢুকতে দেবে না। ওদের বিশ্বাস ঠাকুরকে স্পর্শ করে প্রণাম করলে রোগ বাড়বে ঠাকুরের।

তবে কি হবে? আশঙ্কায় দুচোখ তুলে প্রশ্ন করেন বিনোদিনী।

ওঁরা বলেন, কিন্তু আমি তো ওসব বিশ্বাস করি না। যিনি যুগবাতার— যুগকে উদ্ধার করতে যাঁর আবির্ভাব—তাঁকে তো সবাই স্পর্শ করবেই! সবার পাপ গ্রহণ করার জন্যই তো তিনি এসেছেন এই মাটির পৃথিবীতে—তবে কেন থাকবে এত বাধানিষেধ? না, না, আমি ওসব মানি না। আমি ওসব মানব না বিনোদ।

সেকথায় আনন্দের দ্যুতি বিনোদিনীরও চোখে। আকুল হয়ে তিনি বলেন, তাহলে আমায় নিয়ে যাবেন তো? ঠিক নিয়ে যাবেন তো?

হ্যাঁ। কিন্তু একটু যে মুশকিল হয়েছে বিনোদ। এ বেশে তোমাকে নিয়ে গেলে যে সবাই চিনে ফেলবে। একটা সোরগোল পড়ে যাবে চারিদিকে।

মুহূর্তে কালো হয়ে যায় বিনোদিনীর মুখ। হতাশায় সে বলে ওঠে, তবে কি আমার জীবনদেবতা, আমার ঠাকুরকে আর আমার দেখা হবে না?

কেন হবে না বিনোদ? কিন্তু এভাবে নয়, অন্যভাবে।

অন্যভাবে?

হ্যাঁ। মনে আছে বিনোদ, ঠাকুর প্রথম তোমাকে দেখেছিলেন কোন বেশে।

সে কি ভোলার? তিনি দেখেছিলেন আমায় শ্রীচৈতন্য বেশে।

হ্যাঁ, সেই পুরুষের বেশেই তোমাকে যেতে হবে।

পুরুষের বেশে?

ভয় পাবার তো কিছু নেই। থিয়েটারে তো তুমি অনেক পুরুষচরিত্রে অভিনয় করেছ? ভয় কি তোমার?

তবু ঠাকুরকে দেখতে যাব প্রতারণা করে?

উপায় কি বিনোদ, ওরা যে বড় কঠোর, বড় কড়া ওদের নিয়ম। ভয় নেই, তুমি যাবে আমার সঙ্গে। আমি নিয়ে যাব তোমাকে।

তাই হ'ল। হ্যাটকোট পরে বিনোদিনী সাজলেন পুরুষ। মঞ্চে অভিনয় করতে নয়, জীবনদেবতাকে দর্শনের জন্য নিলেন এই ছদ্মবেশ। কালীপদর সঙ্গে যখন পৌছলেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে তখন নিচে ছিলেন শরৎ (সারদানন্দ) প্রভৃতি সেবকের দল। তাঁদের কাছে বিনোদকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে

কালীপদ তাঁকে নিয়ে সোজা এলেন ঠাকুরের কাছে। হ্যাটকোট পরে নটী বিনোদিনী ঠিক পুরুষেরই মত এসেছিলেন শ্যামপুকুর বাটীতে। তাই শরৎ প্রভৃতি তাঁকে চিনতেই পারেননি। ওপরে ঠাকুরের ঘরে যেতে তিনি কালীপদকে বললেন, তোমার সঙ্গে সাহেবটি কে?

কালীপদ গম্ভীর স্বরে বলেন, আমার বন্ধু। ততক্ষণে বিনোদিনী মাথা থেকে খুলে ফেলেছেন টুপি। চুলও এবার স্বাভাবিক। এবার তাঁকে চিনতে পেরে ঠাকুর বলেন, তোমার বন্ধু কোথায়—ও যে বিনোদিনী—ও যে বিনোদ। আয় মা আয়।

বিনোদিনী ঠাকুরের পায়ে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকেন। আর ঠাকুর তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে থাকেন।

একটু বাদে ঠাকুর বলেন, তা রঙ্গময়ী মা আমার, এমন বেশে এসেছিস কেন মা?

উত্তর দিলেন কালীপদ। কি করবে, এখানে যে ওরা সবাইকে আসতে দিচ্ছে না। নতুন কাউকে আনাতে ওদের যে ভারি আপত্তি। তাই তো ওকে এই বেশে নিয়ে এসেছি এখানে।

শুনে ঠাকুরের সে কি হাসি। হাসতে হাসতেই তিনি বলেন, বেশ করেছিস মা—বেশ করেছিস। প্রাণে যখন টান আসবে তখন কোন কিছু না মেনে এমনি-ভাবেই আসতে হয়। তাহলেই পাবি তাঁকে। শুনিসনি বিল্বমঙ্গলের কথা, নদীতে মড়াকে কাঠ ভেবে তাকে ধরেই নদী পার হয়ে বিল্বমঙ্গল এসেছিলেন চিন্তার কাছে। তেমনি ঐকান্তিকতা নিয়ে মা'র স্মরণ নিলে, তিনি কি দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন! পাবি, পাবি তুই তাঁরও করুণা। তোর চৈতন্য হোক মা চৈতন্য হোক। শুধু বলবি, হরি গুরু, গুরু হরি।

সেদিন শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের ঘরে যখন এই নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় তখন সেখানে ছিলেন না আর কেউ। পরে ঠাকুর যখন তাঁর ভক্ত সাধকদের ডেকে সব বলে হাসতে থাকলেন তখন তাঁরাও কালীপদর ওপর রাগতে গিয়েও আর রাগতে পারলেন না।

এমনিভাবেই এই শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের এই নটীকে উদ্ধারের পথে আরো দিলেন এগিয়ে। আর শ্যামপুকুর বাটী হয়ে রইল এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।

ঠাকুরের ভক্ত সুরেশ মিত্র। বড় চাকুরে। বনেদী পরিবারের ছেলে। বাড়িতে একসময় দুর্গাপুজো হ'ত। কিন্তু একবার একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর বন্ধ অ'ছে সে পুজো। সুরেশ মিত্রের ব্যাপারটা ভাল লাগে না। জগজ্জননীর পুজো। বিঘ্ন পড়ার জন্য তা কি বাদ থাকতে পারে? মা কি পারেন ছেলের পুজো প্রত্যাখ্যান করতে?

সুরেশ মিত্র যাই বলুক, বাড়ির আর যারা আছে তাদের কিন্তু এক কথা, না, বাধা পড়ে পুজো যখন বন্ধ হয়েছে তখন আর নয়। মা'র পুজো করে শেষে কি সংসারে সর্বনাশ হবে।

এই কথাটাই মানতে পারছেন না সুরেশ মিত্র। মা'র পুজো করে ছেলের কি কখনও ক্ষতি হতে পারে? সেবার হয়ত কোন ত্রুটি হয়েছিল তাই বাদ গেছে সেবার, তা বলে চিরতরে বাদ যাবে কেন?

বাড়িতে কারো মত না পেয়ে গুম মেরে যান সুরেশ মিত্র। গোঁজ হয়ে বসে থাকেন তিনি ঠাকুরের কাছে। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে ঠাকুর বলেন, কি গো, সুরেন্দর, তোমার কি হ'ল! সুরেশকে ঠাকুর আদর করে ডাকেন সুরেন্দর বলে। অন্যদিন ঠাকুরের কাছে এলেই সুরেশ মিত্রর প্রাণটা যেন আনন্দে ভরে যায়। কিন্তু আজ এতক্ষণ ধরে বসে আছেন, ঘরেতেও করে এসেছেন অশান্তি তবু ঠাকুর কিছু বলছিলেন না দেখে মনে মনে সুরেশ মিত্র যখন অশান্ত হয়ে উঠছিলেন, সেই সময়ই ঠাকুর বলেন, কি গো সুরেন্দর? ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলে জল। সে জল চোখ দিয়ে গড়িয়ে ভাসিয়ে দেয় বুক।

ঠাকুর বলেন, কি হ'ল, কাঁদছ কেন?

আচ্ছা, মা কি ছেলের পুজো প্রত্যাখ্যান করেন?

তাও কি কখনও পারেন?

তবে?

কি তবে?

ঠাকুরের একথার উত্তরে জানান তাঁদের পারিবারিক পুজোর কথা। বলেন, আমি আবার মা'কে আনব আমাদের বাড়িতে, আবার পুজো করব।

বেশ তো কর না।

সবাই যে বারণ করছে, বাধা দিচ্ছে।

দিক না। তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন মাকে বাড়িতে আনো, পুজো কর।

ঠাকুরের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে, আশ্বাস পেয়ে সুরেশ মিত্র লুটিয়ে পড়েন তাঁর পায়ে, বলেন, তুমি আমার বুক থেকে পাষাণ নামিয়ে নিলে। এখন আর আমি কাউকে ডরাই না। আমি পুজো করব মা'র। মাকে আনব আমার বাড়িতে।

সুরেশ মিত্র আনন্দে তখন যেন পাগল। সেই মুহূর্তে ছুটে রওনা হন বাড়ির দিকে। দরজার কাছে গিয়েই কিন্তু আবার ফিরে আসেন সুরেশ। তাঁকে ফিরতে দেখে ঠাকুর বলেন, কি হ'ল, ফিরলে যে সুরেন্দর।

সুরেশ মিত্র এবার যেন কেঁদে ফেলেন, কিন্তু তোমার যে এই অসুখ—তুমি যে যেতে পারবে না। তোমাকে ছাড়া কি করে করব পুজো ?

এই কথা ? হেসে ওঠেন ঠাকুর। ওরে আমি আছি। আমি থাকব তোর পুজোর সামনে। তুই ভাবিস নে- যা— যা পুজোর আয়োজন কর।

এবারের এই পরম আশ্বাসে সুরেশ মিত্র একেবারে নির্ভয়। একাই মহাউৎসাহে শুরু করেন পুজোর আয়োজন। বাধা আসে চারিদিক থেকে। সর্বনাশ হয়ে যাবে —বন্ধ কর পুজো। সুরেশ মিত্রর কিন্তু একটাই কথা, ঠাকুর যখন আশ্বাস দিয়েছেন, তখন আমি ভয় পাইনে কাউকে। পুজো আমি করবই।

পুজোর কয়েকদিন আগেই বাড়ির কয়েকজন একটু অসুস্থ হয়ে পড়ল। এবার সবাই মিলে বলল, এখনও থামাও, বন্ধ কর তোমার পুজো।

সুরেশচন্দ্র কিন্তু নির্বিকার। একবার যখন ভেবেছি পুজো করব, একবার যখন পেয়েছি তাঁর আশীর্বাদ, তখন থামবো কেন ? না, পুজো হবেই।

দেখতে দেখতে এসে গেল বোধনের দিন। যথারীতি বোধনের পর শুরু হ'ল পুজো। ষষ্ঠী, সপ্তমী, কেটেছে নির্বিঘ্নে। এল অষ্টমী পুজো। ঠাকুর রয়েছেন সেই শ্যামপুকুর বাটীতেই। ইচ্ছে থাকলেও শরীর আর ডাক্তারের বাধা তাঁকে ধরে রাখল ওই বাটিতেই। তাঁর সুরেন্দরের বাড়ি আর যাওয়া হ'ল না।

সেদিন মহাষ্টমী। সিমলাতে সুরেশ মিত্রের বাড়ি হচ্ছে মাতৃপূজা। এদিকে শ্যামপুকুর বাটীতে বসে ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করছেন সুরেশ মিত্রের পুজো নিয়েই। বলছেন, প্রাণে যখন টান আসবে তখন আর কেউ তাকে রুখতে

পারবে না। কৃষ্ণের বাঁশি শুনলে রাধা যেমন কুল, মান, আলো-অন্ধকার, বর্ষা-বাদলা সবকিছু উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়তেন পথে—তেমনি আবেগ আনতে হবে—রোখ আনতে হবে সেই চাষীর মত, যে একদিনে নদী থেকে নালা কেটে ক্ষেতে জল আনবে বলে কোদাল নিয়ে নেমেছিল মাঠে। বেলা গড়িয়ে যায়, বউ এসে বলে, কই চল খাবে চল। চাষী বলে, দাঁড়া আগে কাজটা সেরে নি তারপর যাব। দুপুর যায়, বিকেল আসে। বৌ আবার বলে, চাষীও শোনায় এক কথা। তারপর সন্ধ্যেবেলায় সত্যি সত্যি যখন নালা দিয়ে জল এল ক্ষেতে তখন তার আনন্দ দেখে কে? চানটান করে বেশ মৌজ করে খেতে বসল সে। তেমনি টান আনতে হবে তাঁকে পেতে হলে। সুরেন্দর আমার তেমনি টানে করছে পুজো।

বেলা তখন চারটে। ঠাকুরের কাছে একে একে এসে উপস্থিত হয়েছেন ডাক্তার সরকার, তাঁর আরেক ডাক্তার বন্ধু, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরো অনেকে।

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় গান ধরলেন, কে জানে মন কালী কেমন? তারপর একে একে গাইতে লাগলেন, তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, চিন্ময় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন—ইত্যাদি।

নরেন্দ্রনাথের সে গান শুনতে শুনতে সবাই আনন্দবিহ্বল। ঠাকুর নিজে ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন গানের বিভিন্ন কথার অর্থ। কথা বলতে বলতে ঠাকুরের কখনও বা ভক্তদের কারো কারো সামান্য সময়ের জন্য চৈতন্য হারাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ডাক্তারের এবার যেন হুঁশ হ'ল। এতক্ষণ তিনি পরমানন্দে ভাসছিলেন নরেন্দ্রনাথের গানের স্রোতোধারায়। এবার তিনি সম্বিত পেয়ে পরম আবেগে জড়িয়ে ধরলেন নরেন্দ্রনাথকে আপন পুত্রের মত স্নেহে।

এবার ঠাকুরের কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে এলে আমার সময়ের আর হুঁশ থাকে না। তুমি আমার সবকিছু গোলমাল করে দিলে দেখছি। যাক্ এবার বিদায় দাও, যাই।

সে কথায় ঠাকুরও হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই তিনি কিন্তু হলেন সমাধিস্থ। তাঁর সেই ভাব দেখে ভক্তরা বলাবলি করতে লাগলেন, দেখেছ—দেখেছ, এখন সন্ধিপুজো কিনা, তাই ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। ঠিক এই সময়ে সমাধি হওয়াটা কিন্তু বড় বিচিত্র ব্যাপার।

ডাক্তার সরকার এবং তাঁর বন্ধু ডাক্তারটি একসময় ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে

শুরু করলেন। স্টেথো দিয়ে তাঁরা দেখলেন হৃদস্পন্দন। ঠাকুরের উন্মুলিত চোখ সঙ্কুচিত হয় কি না তা দেখার জন্য ডাক্তারের বন্ধুটি ঠাকুরের চোখে আঙুল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিলেন।

হতবুদ্ধি দুই ডাক্তার স্বীকার করলেন, বাইরে দেখতে সম্পূর্ণ মৃতের মত ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে নেই। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা যাই বলুন, এ জিনিস তাঁদের জানা নেই। এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে না তাঁদের বিজ্ঞান।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সমাধি ভঙ্গ হ'ল। ঠাকুর ফিরে এলেন স্ব ভাবে। ডাক্তার এবং তাঁর বন্ধু সমাধি ভঙ্গ পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন এবার তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ঠাকুর আবার বিছানায় বসে আস্তে আস্তে বলতে থাকলেন, দেখ, একটু আগে এখান থেকে সুরেন্দরের বাড়ি পর্যন্ত যেন একটা জ্যোতির রাস্তা খুলে গেল। দেখলাম সুরেন্দরের ভক্তিতে প্রতিমায় মা'র আবেশ হয়েছে। তৃতীয় নয়ন দিয়ে তাঁর জ্যোতিরশ্মি নির্গত হচ্ছে। দালানের ভিতরে দেবীর সামনে ১০৮টি প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়েছে। আর উঠোনে বসে সুরেন্দ্র ব্যাকুল হয়ে শুধু মা-মা বলে কাঁদছে।

হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন, তোমরা যাও—তোমরা তাড়াতাড়ি আমার সুরেন্দরের বাড়িতে যাও। তোমাদের দেখলে ও অনেক সুস্থ হবে।

ঠাকুরের কথায় নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম করে শ্যামপুকুর থেকে রওনা হয়ে গেলেন সিমলা। সেখানে সুরেশ মিত্রকে দেখে তাঁরা বললেন, ঠাকুরের সব কথা। সুরেশ মিত্র যত শোনেন, ততই কাঁদেন। বলেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ—এইতো, এইতো এখানে সাজানো হয়েছিল প্রদীপ সন্ধিপুজোর জন্য। আর এই বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে আমার মনপ্রাণ কেমন যেন হয়ে উঠল। কেমন একটা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল আমার বুক ঠেলে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। কাঁদতে লাগলাম মা-মা বলে।

নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে জড়িয়ে ধরে সুরেশ মিত্র বলতে লাগলেন, ওগো আমার ঠাকুর সেখানে বসে বসেই দেখে গেলেন আমার এখানকার পুজো। তোমরা কত ভাগ্যবান, তোমরা আমার ঠাকুরের সেভাব দেখলে—কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না। তোমাদের স্পর্শ করলেও যে পুণ্য হয়—তোমাদের স্পর্শ করলেও পুণ্য হয়। সুরেশ মিত্র সেদিন উন্মত্তের মত বারে বারে জড়িয়ে ধরেন সবাইকে।

দেখ, ঈশ্বরকে ওই ভক্তি পুজো যা বল তা বুঝতে পারি, কিন্তু সেই অনন্ত ভগবান মানুষ হয়ে আসেন এই কথা বললেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন হয়ে এসেছেন একথা বোঝা বড় কঠিন। ওই নন্দনের দলই দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়েছে একবারে।

ডাক্তারের সেদিনের সেকথায় ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এ বলে কি? তবে ওই গোঁড়ারা অনেক সময় তাঁকে বাড়াতে বাড়াতে ওইরকম করে ফেলে বটে।

আসলে ডাক্তার প্রথম যখন ঠাকুরের চিকিৎসা করতে আসেন তখন তাঁর বিজ্ঞানী মন প্রশ্ন ছাড়া, পরীক্ষা ছাড়া শুধু শুনেই কোন কিছু মানতে নারাজ। সবকিছু তিনি নিজের চোখে দেখতে চান, তর্ক করে সব কিছু সংশয় নাশ করতে চান। তাই তাঁর ওই সংশয়ী মনকে ঠাকুর বরং দিয়েছিলেন প্রশ্রয়ই। একে একে নানা ঘটনা তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তটাকে করেছিল পাকা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঠাকুর সেদিন শুধু ডাক্তারেরই সংশয় নাশ করেননি, যুগের সংশয়েরও ঘটিয়েছিলেন অবসান।

সেদিন ঠাকুর ডাক্তারকে বলছিলেন, দেখ ডাক্তারি কর্মটি যদি নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকারের জন্য করা যায়, তবে সেটি মহৎ কর্ম। কিন্তু শুধু টাকার জন্য বাছে, হাগা এসবের রং দেখা খুব খারাপ কাজ। তবে হ্যাঁ, যে কর্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী লোকের মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে নেয়। যেমন ধর গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্যলোক দেখলে মুখ নিচু করে চলে যায় বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আরেকজন গাঁজাখোর দেখলে আনন্দে হয়ত কোলাকুলি করে। দেখনি শকুনি কেমন শকুনির সঙ্গে থাকে।

সেকথার জের টেনে ডাক্তার বলেন, শকুনি কিন্তু কাকের ভয়ে পালায়। তবে আমি বলি শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি তো প্রায়ই চড়ুই পাখিদের ছোট ছোট ময়দার গুলি করে খাওয়াই।

খুব ভাল, খুব ভাল। সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি খাওয়ান দেখনি। ওইটে মনে রাখবে—জীব সেবা। জীবকে সেবা ঈশ্বরেরই সেবা।

কথা বলতে বলতে ঠাকুর যেন ভাবতন্ময় হয়ে যান। তাঁর সেই ভাবে ছেদ টানতেই ডাক্তার বলেন, আচ্ছা, আজ আর গান হবে না?

ঠাকুর তাঁর কথায় হেসে বলেন, সেদিনের মত যদি হয়। ডাক্তারও হাসেন সেকথায়।

ডাক্তার তখন প্রথম প্রথম আসতেন ঠাকুরের চিকিৎসা করতে। এসেই তো ঠাকুরকে কথা বলা একদম বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, ওসব গান-টান একদম নয়। গান শুনে পিড়িং পিড়ি করে নাচলে রোগ আরো বাড়বে তখন আর আমার বাবা এসেও তা সারাতে পারবে না।

এত বলেও ডাক্তার নিজেই কথা বলে যান ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গানও হয় যথারীতি। সেদিন ঠাকুর একজনকে বললেন, গা তো, ওই যে 'কে জানে মন কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।'

রামপ্রসাদের এই গানটি ঠাকুরের বড প্রিয়। ভক্তটিও গাইতে লাগলেন মনপ্রাণ ঢেলে। গাইতে গাইতে গায়ক ভুল করে গান 'আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বোঝে না'—সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বলেন, না—না, হ'ল না। ওটা হবে 'আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না।' ব্যাপারটা কি জান, মন ঈশ্বরকে জানতে গিয়ে সহজেই বোঝে, ওই অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে ধরা আমার কর্ম নয়। কিন্তু প্রাণ কেবলি আকুলিবিকুলি করে—বলে কি করে আমি তাঁকে পাব?

কথাটা শুনে ডাক্তার বলেন, ঠিক, ঠিক বলেছ, যত গোল বাধায় মন। আসলে কি জান, মন ব্যাটা বড ছোটলোক। বড অল্পতেই এলে দিয়ে বলে পারব না। প্রাণ সেকথা শোনে না বলেই সম্ভব হচ্ছে যত আবিষ্কার। নাহলে কোথায় থাকত এসব।

গান শুনতে শুনতে কয়েকজন যুবকভক্ত সমাধিস্থ হলেন। তাঁদের দেখিয়ে ঠাকুর বলেন, দেখ তো, দেখ তো, কি হয়েছে?

ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেন, দেহে জীবনের সব ইঙ্গিতই রয়েছে কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। ডাক্তার সব কিছু দেখে হতভম্ব।

ঠাকুর তাদের বুকে হাত বুলিয়ে একবার নাম শোনাবার পরই তারা আবার সেই আগের মত। ঠাকুর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসেন। ডাক্তারও হেসে বলেন, এসবই দেখছি তোমার খেলা।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলেন, না—না আমি নয়গো, এসব তাঁরই ইচ্ছায়। এদের স্ত্রী-পুত্র, টাকা-কড়ি, যশ-মান ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়েনি বলেই তাঁর নামগান শুনে তন্ময় হয়ে ওরকম করে থাকে।

শুধু সেদিনই নয়, আরো কয়েকদিন ঠাকুর এবং ভক্তদের ভাবতন্ময়তা দেখে ডাক্তার তাঁর আগের ধারণা অনেকটা বদলে ফেলেছেন। শুধু তাই বা কেন, ডাক্তারী বিজ্ঞানী মনও শুষ্ক বিদ্যার ভারে এতদিন খড়খড়ে থাকলেও এখন আস্তে আস্তে যেন রসময় হয়ে উঠছে। তবে এখনও বুঝি একটু অহঙ্কার আছে, তাই ভক্তির কথা বলতে লজ্জা হয়।

ঠাকুর সবই বোঝেন। বোঝেন বলেই মাঝে মাঝে ডাক্তারকে একটু উসকিয়ে দিতে চান। আর সেটা চান বলেই গানের কথায় বললেন, যদি সেদিনের মত হয়। ডাক্তার বলেন, ভালই তো—জ্ঞানের দরজাটা তাহলে আরো একটু খুলে যাবে।

হেসে ঠাকুর বলেন নরেনকে, নে তবে একটা গান শোনা। ঠাকুরের আদেশ পেযে নরেন টেনে নেয় তানপুরাটা। তারপর সুর বেঁধে গান ধরে—

সুন্দর তোমারি নাম দীনদরশন হে
বরিষে অমৃতধার, জুড়ায় প্রাণ মন হে।
এক তব নাম ধন, অমৃত ভবন হে
অমর হয় সেই জন, যে করে কীর্তন হে।

ও গান শেষ হতে না হতেই নরেন ধরেন শ্যামাসঙ্গীত

আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে॥
(ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল করে)
(ওমা) তোমার প্রেমের সুরা, পাবে কত মাতোয়ারা
ওমা ভক্তি চিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে।··

গানের পর সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে 'আমায় দেমা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে' বলেই ভাবোন্মত্ত হলেন। তারপরেই উঠলেন স্বয়ং ঠাকুর। তারপর ডাক্তার—তারপর সবাই।

সেদিনের সেই দৃশ্যটি বন্দি হয়ে আছে কথামৃতের পাতায়। কথামৃতকার লিখেছেন, 'ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে তিনি দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁশ নাই,

ডাক্তারেরও হুঁশ নাই। ছোট নরেনেরও ভাবসমাধি হইল। লাটুরও ভাবসমাধি হইল। ডাক্তার সায়েন্স পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে তাহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই সকলেই স্থির নিস্পন্দ ; ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ কেহ হাসিতেছেন। যেন কতকগুলি মাতাল।'

রাত তখন আটটা বেজে গেছে। ঠাকুর আবার স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে বলেন, আচ্ছা এসব তোমার কি মনে হয় ? এসব কি ঢং ?

ডাক্তার বলেন, ঢং মনে হলে কি আর এখানে আসতুম। জান নরেন, তুমি যখন গাইছিলে—'আমায় দে মা পাগল করে' তখন আর থাকতে পারিনি। তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম। ভাবলুম ভাব ডিসপ্লে করা চলবে না।

ঠাকুর হেসে বললেন, তা করবে কেন ? তুমি যে অটল অচল সুমেরুবৎ। তুমি গম্ভীরাত্মা। জান তো, ডোবায় হাতি নামলে জল তোলপাড় কিন্তু সায়ের দীঘিতে নামলে টেরই পাওয়া যায় না। তা তুমি হচ্ছ সেই সায়ের দীঘি।

সে কথায় সবাই হাসেন, মাথা নিচু করেন ভক্তরা।

শ্যামপুকুরে ঠাকুরের চিকিৎসা চলছে যথারীতি। কোনও কোনও সময় ওষুধে কাজও হচ্ছে। কিন্তু শুধু ওষুধে কি হবে ; বাধা-নিষেধ যা আছে তার কোনটাই মানা হচ্ছে না, বরং অত্যাচারই হচ্ছে একটু বেশি।

কথা বললে, ভাবের উদ্দীপন হলে ঠাকুরের গলার ক্ষতে পড়ে চাপ—ফলে রক্তপাতও হয়। ঠাকুরের কিন্তু সেদিকে হুঁশ মোটেই নেই। বরং আগে যত কথা বলতেন এখন যেন তার মাত্রাটা বেড়েছে বেশি।

হয়ত তিনি নিজেই বুঝেছিলেন, এই স্থূলদেহ আর বেশিদিন তাঁকে ধারণ করতে হবে না। তাই যাবার আগে উজাড় করে দিয়ে যাবার ব্রত নিয়েছিলেন তিনি। সবাইকে দিতেন অবাধ দর্শন, স্পর্শ করতে দিতেও এতটুকু আপত্তি নেই। আর আপত্তি নেই কথায়।

যার যত জিজ্ঞাসা—তারই উত্তর দিচ্ছেন তিনি। এতটুকু ক্লান্তি, অনিচ্ছা

নেই। বরং ভাবখানা, ওগো তোমাদের যার যা জানার আছে এইবেলা জেনে নাও। এরপর কিন্তু না হলে আপসোস করতে হবে।

তাঁর সেই অনুচ্চারিত উদার আহ্বানের সুর বোধ হয় অদৃশ্য ভাবেই সবার হৃদয়বীণাকে দিয়েছিল বাজিয়ে। তাই বাইরে দূরে, সামনে কাছে যাঁরা ছিলেন, যাঁরা এতদিন তাঁর কথা শুনেও কি জানি কি ভেবে আসেননি তাঁর কাছে—তাঁরা সবাই আসতে লাগলেন—দল বেঁধে—একা একা।

সেদিন বিকেলে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছেন যখন ঠাকুর সেই সময় এলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সাধন জগতের এক দিকপাল পুরুষ বিজয়কৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে বহুদিন বহুসময় তিনি কাটিয়েছেন ঠাকুরের সঙ্গে নানা তত্ত্ব আলো-চনায়। ঠাকুরের সঙ্গে গেছেন তিনি পাঠবাড়িতে, গেছেন আরো বহু জায়গায়। যতই এসেছেন ততই যেন আকর্ষণ বেড়েছে।

বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা। সমাজের কাজে, সমাজকে প্রসারিত করতে, দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে পাঠান হ'ল ঢাকায়।

ঠাকুরের সঙ্গলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও বিজয়কৃষ্ণ কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠাতে সমাজের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও আনুগত্যে ঢাকায় গিয়ে কাজ করতে থাকলেন। স্থূলে তাঁরা দুজনেই তখন বহু যোজন দূরে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁদের হ'ত নিত্য আনাগোনা, জানাশোনা, আলাপ আলোচনা।

ঢাকাতে বিজয়কৃষ্ণ একসময় অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন। এমন সময় দেখলেন ঘরে এলেন স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি এসে বসলেন তাঁর পাশটিতে। বিজয়কৃষ্ণ তো অবাক। এটা কী করে সম্ভব ? ঠাকুর রয়েছেন সেই দক্ষিণেশ্বরে। তিনি রয়েছেন এখানে, অথচ দিব্যি তো এলেন ঠাকুর। কই তাঁর ঢাকা আসার তো কোন কথা নেই, এসেছেন যে সে খবরও তিনি পাননি। তবে কেমন করে এলেন তিনি ? এ কি তবে মায়া ? না কি বিভ্রম ?

বিজয়কৃষ্ণ নিজের মনে যুক্তিতর্কের জাল বুনে যাচ্ছেন, ঠাকুর কিন্তু হাসছেন। তাঁর সেই মধুর হাসি দেখতে দেখতে বেড়ে যায় ধন্দ। মনে শুধু একটাই প্রশ্ন, কে ইনি ? ইনিই কি সেই ?

বিজয়কৃষ্ণ এত কাছে পেয়েও যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে ঠাকুরের গা স্পর্শ করেন। কই, কোন অসুবিধে তো হচ্ছে না ? তিনি তো ভালভাবেই ধরতে পারছেন ঠাকুরকে। শুধু মুখের কথাই যা হচ্ছে না, বাকি সবই তো বাস্তব ? এ কেমন করে হচ্ছে ?

বিজয়কৃষ্ণ দিশেহারা। রামকৃষ্ণ সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়টিতে তিনি যেন ঢেউ তুলে গেলেন। বিজয়কৃষ্ণ হলেন অস্থির অশান্ত।

ঢাকা ছেড়ে বিজয়কৃষ্ণ এক সময় বেরিয়ে পড়লেন পশ্চিমে। ঘুরলেন তীর্থে তীর্থে। কিন্তু না, তিনি যা খুঁজছেন তা পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন না শান্তি, পাচ্ছেন না তাঁর পরমকে।

এই সময়ই তিনি শুনলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাঁকে আনা হয়েছে কলকাতায়। এসেই সেই বিকেলে তিনি এলেন শ্যামপুকুরে। ঠাকুর তখন খাওযার পরে বিশ্রাম করছেন।

বিজয়কৃষ্ণকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণের মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হ'ল এক দিব্য হাসিতে। ছড়িয়ে পড়ল অকথিত বাণী—বিজয় এলি ?

বিজয়কৃষ্ণ এসেই লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুরের পায়, বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি ঠাকুরের চরণ দুটি। তাঁর ওই ভাব দেখে সবাই বিস্মিত।

সেদিন সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ, মহিমা চক্রবর্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাস্টার, ছোট নরেন ইত্যাদি আরো অনেকে।

বিজয়কৃষ্ণের ভাব দেখে মহিমা চক্রবর্তী বলেন, মশাই, অনেক তীর্থ তো করে এলেন, কি দেখলেন বলুন ?

বিজয়কৃষ্ণ তখনও রয়েছেন যেন একটা ঘোরের মধ্যে। সেই অবস্থাতেই তিনি বলেন, কি আর বলব বলুন, দেখছি যেখানে এখন বসে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দু আনা, কোথায় চার আনা, ব্যস এই পর্যন্ত। পুরোপুরি ষোল আনা সে শুধু এখানেই দেখছি।

বিজয়কৃষ্ণের সে কথাতে সায় দিয়ে মহিমা চক্রবর্তী বলেন, ঠিক বলেছেন, ইনিই সব। আবার ইনিই ঘোরান, ইনিই বসান।

ঠাকুর এতক্ষণ যেন নিবিড়ভাবে দেখছিলেন বিজয়কৃষ্ণকে। সেই কবে দক্ষিণেশ্বরে শেষ দেখা। তারপর স্থূলে এই প্রথম। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর বিজয় যেন কত বদলে গেছে। তার চেহারা মুখ চোখের ভাব সব যেন নতুন। ঠাকুর দেখেন আর বিস্ময়ে আনন্দে মগ্ন হন। নরেন্দ্রনাথকে ডেকে তিনি বলেন, ওরে দেখ, দেখ, বিজয়ের অবস্থা কি হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড়, কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি পরমহংস।

ঠাকুরের কথার ইঙ্গিতে সবাই বোঝেন বিজয়কৃষ্ণেরও এসেছে পরমহংস অবস্থা। বুঝি একটু নিঃসংশয় হতেই মহিমা চক্রবর্তী আবার প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, আপনার খাওয়া কি খুব কমে গেছে?

বিজয়কৃষ্ণ কিন্তু সেই আগের ভাবেই বলে, তা বোধহয় গেছে। আসলে বিজয়কৃষ্ণ এখানে নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিতে চান। তাই তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে বলেন, আপনার অসুখের কথা শুনে দেখতে এলাম।

ঠাকুর সে কথার উত্তরে শুধু একটু হাসলেন। সে হাসি স্নেহের।

বিজয়কৃষ্ণ আবার যেন কি বলতে গিয়েও থেমে যান। তাঁর সে ভাব ঠাকুরের নজর এড়ায় না। তিনি বলেন, কিরে কিছু বলবি?

বিজয়কৃষ্ণ একটু কিন্তু কিন্তু করে বোধহয় শোনাতে যান তাঁর ঢাকার দর্শনের কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা শেষ না করে শুধু বলেন, আবার ঢাকা থেকে—

কি?

ঠাকুরের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিলেন না বিজয়কৃষ্ণ। একটু সময় চুপ করে থেকে তিনি শুধু বললেন, ধরা না দিলে ধরা বড় শক্ত। এইখানেই ষোল আনা।

সেই কথার পিঠেই ঠাকুর শোনালেন কেদার চাটুজ্জের কথা। পরমভক্ত কেদারনাথ হালিশহরের লোক, কিন্তু বহুদিন ছিলেন ঢাকায়। সেই কেদারনাথ ঠাকুরকে বলতেন, অন্য জায়গায় খেতে পাই না, এখানে এসে পেটভরা।

পেটভরার অর্থ ঠিকমত বুঝতে না পেরে মহিমা চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করেন, ওই পেটভরা বললেন, ওই পেটভরা কি? উপচে পড়ছে?

ঠাকুর উত্তর দেবার আগেই বিজয়কৃষ্ণ হাতজোড় করে গদগদ কণ্ঠে বলেন, আর বলতে হবে না আপনি কে? আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি।

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই কিন্তু ভাবস্থ হন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই ভাবেই তিনি বলেন, যদি সেই বোধ হয়ে থাকে তো তাই।

বিজয়কৃষ্ণ আবারও শুধু বলেন, বুঝেছি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি ভাবের আবেগ আসে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে। মন বুঝি চলে যায় তাঁর কোন্ এক অচিনলোকে। সেই অবস্থাতেই তিনি আবার লুটিয়ে পড়েন ঠাকুরের পায়। তাঁর চরণধুলো বারবার নেন আর তা লাগান বুকে, মাথায়, গায়। তারপর তাঁর পা দুটিকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে পড়ে থাকেন চুপচাপ। শ্রীরামকৃষ্ণও তখন

ভাবস্থ। ছবির মত নিশ্চল নিস্পন্দ। চোখ তখন তাঁর স্থির। প্রেমের ঠাকুর তখন যেন ধরা দিয়েছেন প্রেমিকের কাছে।

সে এক দিব্যদৃশ্য। প্রেমাবেশের সেই অপূর্ব মুহূর্তের সাক্ষী যাঁরা তাঁরা ধন্য। তাঁরা সে মহামিলন দেখছেন নিজের নিজের ভাবে। তাঁরা কেউ কাঁদছেন, কেউ স্তব করছেন আবার কেউ বা বাক্‌রহিত শুধুই চেয়ে আছেন ঠাকুরের দিকে।

কারো চোখে ঠাকুর যেন পরমভক্ত, কেউ ভাবছেন সাধু আবার কেউ বা দেখছেন তাঁকে সাক্ষাৎ দেহধারী ভগবান হিসেবে।

সে দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখের জলে ভেসে মহিমাচরণ গেয়ে উঠলেন, দেখ প্রেমমূর্তি—তারপর ব্রহ্মদর্শনের আনন্দে মাঝে মাঝেই বলছেন—

তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিতম্।

গান ধরলেন ভূপতি—

জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোকে তুমি প্রেমের আকর ভূমি
মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
... ...
মিলি স্থর, নর, ঋভু প্রণমে তোমারে বিভু
তুমি সর্বমঙ্গল আলয়।
দেও জ্ঞান দেও প্রেম দেও ভক্তি দেও ক্ষেম
দেও দেও ওপদে আশ্রয়।

সে গান থামিয়েই ভূপতি আবার গান,

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।

এমনি স্তব আর গানের মধ্য দিয়ে কেটে যায় অনেকটা সময়। আস্তে আস্তে স্ব-ভাবে আসেন ঠাকুর। বিজয়কৃষ্ণও হন প্রকৃতিস্থ।

এই ঘটনায় ঠাকুর নিজেই যেন লজ্জা পান। তাই যেন কৈফিয়তের স্বরেই মাস্টারকে বলেন, কি একটা আবেগ হয়। এখন লজ্জা হচ্ছে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না।

তারপরও কিন্তু নানা তত্ত্বকথা হয়। এরি মধ্যে আসেন ডাক্তার সরকার। তিনি ঠাকুরের ভাব নিয়ে নানা তর্কও করেন আবার তাঁকে দেখার জন্য ছটফটানিরও অন্ত নেই তাঁর। শিকল কাটতে এসে মনে মনে তিনি নিজেই যেন বাঁধা পড়েন ঠাকুরের কাছে, সেদিন ভাবে উন্মত্ত হয়েছিলেন তিনিও।

যত মত তত পথ।

এ কোন কথা নয়, এ এক জীবনদর্শন অথবা বলা যায় অধ্যাত্মজগতের শেষ কথা এটি।

তিনি আছেন—আছেন আপন মন্দিরে! সে মন্দিরের দ্বার অবারিত। যে খুশি, যেমন ভাবে খুশি তেমনি ভাবে আসতে পারে সেখানে। কেউ বাধা দেবে না সেখানে আসতে।

তবে হ্যাঁ, আসতে হবে, আসার ইচ্ছেটা জাগাতে হবে মনে। কেমন করে আসবে—তা ঠিক করে নাও তুমিই।

তোমার কালীঘাটে যাবার ইচ্ছে তুমি ঘোড়ার গাড়িতে যেতে পারো, ট্যাক্সি কিংবা নিজের বা বন্ধু-বান্ধবের মোটর চেয়ে নিয়ে তাতে চেপেও যেতে পারো আবার ট্রাম বাস তো আছেই, এমনকি মন চাইলে হেঁটে গেলেও বাধা দেবে না কেউ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা পথেও যেমন যাওয়া যায় কালীঘাট মন্দিরে তেমনি ঘুরপথেও যাওয়া যায় সেখানে।

আসলে লক্ষ্যটা স্থির রাখতে হবে। তাহলে যে পথেই যাও না কেন, সব পথই শেষ হবে এক জায়গায়।

সাপ লুডো খেলার মত সাপের মুখে পড়লে নামতে হবে, মইয়ের মুখে পড়লে হবে উঠতে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু উঠতে হবে পাকা ঘরে—তাহলেই জিৎ। মানুষের জীবনে সেই জিৎ ঈশ্বরলাভ।

ঈশ্বরকে পাওয়া যায় সর্বভূতে, সর্ব মতে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একথা তাঁর জীবন সাধনারই ফল। তাঁর এই পথ এবং মত তাঁর তরুণ শিষ্যদের কাছে ছিল ধ্রুব সত্য। তাই ভিন্ন ধর্মীরাও ছিলেন তাঁদের কাছে সমান নমস্য। তাঁদের এই ইষ্টবুদ্ধি দৃঢ় রাখতেই ঠাকুর নিজে সাধনা করতেন নানা পথে। নানা মতে। তাই তাঁর কাছে সব মানুষের দ্বারই ছিল অনর্গল।

সেদিন (১৮৮৫ সালের ২৭ অক্টোবর) শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরকে দেখতে

এলেন একজন। পরনে তাঁর গৈরিক পোশাক। দেখে মনে হয় কোন সাধু-পুরুষ। চোখ দুটি তাঁর অসম্ভব উজ্জ্বল।

তখন নিচে বসে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ, শরৎ প্রভৃতি ঠাকুরের বালক ভক্তের দল। আগন্তুককে দেখে তাঁরা সাদরে বসালেন সেখানে। জিজ্ঞেস করলেন তাঁর নাম।

মেরা নাম প্রভুদয়াল মিশ্র।

কথায় স্পষ্টই হিন্দীর ছাপ। কিন্তু ভক্তদের বিস্ময় জাগাল তাঁর নাম। বেশভূষা দেখে তাঁরা ভেবেছিলেন বুঝি কোন উচ্চকোটির সাধু। কিন্তু নাম তো একবারে গৃহীর মত। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন তাঁরা। প্রভুদয়ালও বোধহয় বুঝতে পারেন তাঁদের সমস্যা। কিন্তু কিছু না বলে চুপই থাকেন।

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু চুপ থাকার পাত্র নন। তিনি বললেন, দেখুন যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

হাঁ-হাঁ করুন।

আপনার বেশ দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোনো সাধু মহাত্মা।

বলুন-বলুন—

কিন্তু নাম তো বললেন—

প্রভুদয়াল মিশ্র।

হ্যাঁ, তাই বলছিলাম, সাধু হলে অমন গৃহী নাম।

দেখুন একটু ভুল করছেন, গেরুয়া পরলেও আমি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নই, আমি খ্রীস্টান।

খ্রীস্টান?

হ্যাঁ, কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত আমি। ঈশা আমার উপাস্য।

নরেন্দ্রনাথ এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যদি খ্রীস্টান, তো গেরুয়া পরেন কেন?

ওই দেখুন, এই কথাটা আরো অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু একটু সমঝে দেখুন, আমি জন্মেছি ব্রাহ্মণ কুলে। কিন্তু ঈশামসিতে বিশ্বাস করে তাঁকেই ইষ্টদেবতার আসনে বসিয়েছি। কিন্তু তাঁকে ইষ্ট মেনেছি বলে কি নিজের পিতৃপিতামহের আচরিত পথ, চালচলন সব ছেড়ে দিতে হবে?

না, তা নয়, তাহলেও, সব ধর্মেরই তো এক একটা নিজস্ব বেশভূষা আছে।

তা আছে। কিন্তু আমি ওই সঙ্গে যোগশাস্ত্রেও বিশ্বাসী। ঈশাকে ইষ্টদেবতা করে আমি নিত্য যোগসাধনা করি। জাতিভেদে আমার বিশ্বাস নেই সত্যি,

কিন্তু আমি জানি যার তার হাতে খেলে যোগসাধনের পথে হানি হয়। তাই আমি স্বপাকে হবিষ্য খাই।

আশ্চর্য তো!

আশ্চর্যের কি আছে? খ্রীস্টান হয়ে যোগাভ্যাসের ফলে আমারও জ্যোতিদর্শন হয়। আমি একে একে এগিয়ে যাচ্ছি ধ্যানের পথে। তাছাড়া খ্রীস্টান হলেও আমি ভারতীয়। ভারতের ঈশ্বরপ্রেমিক যোগীরা সনাতন কাল থেকে গেরুয়া পরে আসছেন, আজ হঠাৎ একদিনে আমাকে সে সব ছেড়ে দিতে হবে? অসম্ভব তা হয় না। সনাতন ভারতীয়ের বসনের চেয়ে প্রিয়তর বসন আর কী হতে পারে?

প্রভুদয়ালের কথাবার্তায় মুগ্ধ হলেন নরেন্দ্রনাথ। শুধু সাধু হিসেবে মনে হওয়ার চেয়ে এখন সব জেনে শ্রদ্ধাবোধ যেন বেড়ে গেল অনেক। বিশেষ করে তাঁর স্বাদেশিকতা নাড়া দিল নরেন্দ্রনাথকে বেশি করে। তিনি নিজে তো বটেই অন্যান্য গুরুভাইদেরও শেখালেন এই খ্রীস্ট ধর্মযাজককে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে।

সেদিন নিচ থেকে ওপরে তাঁরা যখন প্রভুদয়াল মিশ্রকে নিয়ে গেলেন তখন অন্যদের সঙ্গে মাস্টার, ছোট নরেন প্রভৃতি আরো অনেকে আছেন।

প্রভুদয়ালকে দেখেই ঠাকুরের মুখটি আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি সাদরে কাছে টেনে নিলেন মিশ্রকে।

একটু চুপচাপ থেকেই প্রভুদয়াল বললেন, ওহি রাম ঘট্ ঘটমে লেটা।

তাঁর কথা শুনে ঠাকুর উত্তরটা সরাসরি তাঁকে না দিয়ে ভক্তদের শেখানোর জন্যই যেন আস্তে আস্তে বললেন ছোট নরেনকে, ওরে, জেনে রাখ, এক রাম তাঁর হাজার নাম।

জানিস তো, খ্রীস্টানরা যাঁকে গড্ বলে হিন্দুরা তাঁকে রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর এই সব বলে।

একটা পুকুর তার অনেকগুলো ঘাট। এক ঘাট থেকে জল নেয় হিন্দুরা, বলে জল, ঈশ্বর। অন্য ঘাট থেকে জল নিয়ে মুসলমানরা বলছে পানি, আল্লা। খ্রীস্টানরা আরেক ঘাট থেকে জল নিয়ে বলছে, ওয়াটার—গড্ যীশু। আদতে কিন্তু সেই এক— জল।

হ্যাঁ, যীশু কিন্তু মেরীর সন্তান নয়, যীশু স্বয়ং ঈশ্বর। যেমন এই ইনি—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখন এই আছেন, আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

প্রভুদয়ালের কথায় ভক্তরা শ্রদ্ধায় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে।

তিনি কিন্তু বলে চলেন, আপনারা এঁকে চিনতে পারছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটি বাগানে উনি উপরে আসনে বসে আছেন। মেজের ওপরে আরেকজন বসে আছেন, তিনি তত অ্যাডভান্সড নন।

প্রভুদয়ালের ভক্তির ভাব, তাঁর কথা ভক্তরা যত শুনছেন ততই যেন তাঁদের শ্রদ্ধা আরো বাড়ছে তাঁদের ঠাকুরের ওপর। তাঁদের মন তখন বলে, শুধু তাঁরা নন, আরো—আরো অনেকে এমনকি ভিন্নধর্মীরাও তাঁদের ঠাকুরকে চিনেছেন—ঈশ্বর হিসেবে—ঈশ্বরের অবতার হিসেবে।

মিশ্র বলে চলেন তাঁর বিশ্বাস, তাঁর উপলব্ধির কথা। বলেন, এই দেশে চারজন দারোয়ান আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম, কাশ্মীরে রবার্ট মাইকেল, এখানে ইনি আর পূর্বদেশে আরো একজন। এঁরা থাকতে মানুষের নষ্ট হবার আশঙ্কা কোথায় ?

ঠাকুর এবার প্রভুদয়ালকে জিজ্ঞেস করেন, বলি তুমি কিছু দেখতে টেখতে পাও।

প্রভুদয়াল সবিনয়ে বলেন, আজ্ঞে বাড়িতে যখন ছিলুম তখন জ্যোতিদর্শন হতো। তারপর যীশুকেও দেখেছি। আহা সে কী রূপ, দেখার সে কী আনন্দ। সে রূপ, সে আনন্দের কাছে স্ত্রীর সৌন্দর্য কোন ছার।

প্রভুদয়ালের সে কথায় হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন ঠাকুর। মিশ্র তখন ভক্তদের সঙ্গে বলতে লাগলেন আপন অনুভূতির কথা।

একটু পরেই ঠাকুর বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে এসে বললেন, না বাহ্যে হ'ল না—মিশ্রকে দেখলাম বীরের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কথা বলতে বলতেই পশ্চিমদিকে মুখ করে ঠাকুর হঠাৎ হলেন সমাধিস্থ। ভক্তকণ্ঠে উঠল জয়ধ্বনি—শুরু হ'ল নাম গান।

একটু বাদে আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠাকুর মিশ্রের দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। মুখে তাঁর মৃদু মৃদু হাসি। সে হাসির সামনে মিশ্রও যেন আবিষ্ট।

ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন সেই একই ভাবে, প্রভুদয়ালও তেমনি আছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। ঠাকুর সেই ভাবাবেশেই প্রভুদয়ালের সঙ্গে বারবার করমর্দন করতে করতে বললেন, হবে, তুমি যা চাইছ হয়ে যাবে।

তাঁর সেই অভয়বাণী পেয়ে প্রভুদয়াল হাতজোড় করে বলতে থাকেন, আমি তো সেদিন থেকেই আমার মন প্রাণ শরীর সব আপনাকে দিয়ে বসে আছি।

প্রভুদয়ালের সেকথা শুনে ঠাকুর শুধুই হাসেন, সেদিন ভক্তরা শ্যামপুকুর বাটীতে বসে দেখলেন ঠাকুরের নবরূপের লীলা। লীলাদর্শনে তাঁরা হলেন কৃত-কৃতার্থ। আর প্রভুদয়াল—প্রভুদয়াল সেদিন খ্রীস্টান হয়েও ঠাকুরের আর ভক্তের সঙ্গে বসে খেলেন ঠাকুরেরই প্রসাদ। সেদিন গঙ্গা-জর্ডনের জল মিলে-মিশে হ'ল একাকার।

ঠাকুরই ঈশ্বর।

যে মেনেছে সে তো পার পেয়েইছে। কিন্তু যে মানে নি—মানার সুযোগ পায়নি—তাকেও কাছে টানলেন তিনি—দেখালেন নিজেকে—আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই সেও হ'ল সরব—বলল, তুমি আছ, তুমি সেই, তুমি আমার। এসবই ঘটল এই শ্যামপুকুরে।

প্রথম রসদদার মথুরবাবু, দ্বিতীয় রসদদার শম্ভু মল্লিকের মৃত্যুর পর ঠাকুরের রসদদারির ভার পড়ে সম্ভবত বলরাম বসুর ওপর।

বাগবাজারের বলরাম বসু। কৃষ্ণরাম বসুর বংশধর তিনি। ধর্মপ্রাণতা তাঁর পরিবারের অমূল্য ধন। সে ধনে ধনী তিনিও। যেদিন প্রথম তিনি ঠাকুরকে দেখলেন—সেদিনই সব সমর্পণ করলেন তিনি ঠাকুরের পায়। তাই তো ঠাকুর বলতেন, বলরামের পরিবারই ভক্ত। ওরা ভক্তের ঝাড়। বলতেন, বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন। সে অন্ন খেলে দোষ নেই।

দোষ নেই বলেই, ঠাকুরকে যখন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনা হ'ল তখন তিনি স্পষ্টই বললেন বলরামকে, দেখ ওরা সব চাঁদা করে করছে এটা আমার ভাল লাগছে না। তুমি আমার খাওয়ার খরচটা দিও।

এ তো অনুরোধ নয়, এ আদেশ অথবা বলা যায় বলরামের প্রতি এ হ'ল অহেতুকী কৃপা।

বলরাম কৃপাধন্য। কিন্তু বলরামের যাঁরা আত্মীয় তাঁরা না জেনে না বুঝে ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিলেন না।

বলরাম বসুদের কটকে ছিল জমিদারি। তাঁর বাবা সব ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন বৃন্দাবনে। বলরাম বসু পুরীতে থেকেই করতেন জমিদারি পরিচালনা। কিন্তু চিরকালই তিনি অন্য ধাতের মানুষ, তাই ভাল লাগে না তাঁর এসব।

খুব ছোটবেলায় নিদারুণ অজীর্ণ রোগের শিকার হন তিনি। ফলে ১২টা বছর শুধু সাবু আর যবের মণ্ড খেয়ে কাটিয়েছেন। তাই শরীরের দিক থেকে তিনি তেমন একটা শক্তপোক্ত নন। তাছাড়া তিনি আবার ভক্তিভাবের পথিক।

অবশ্য শুধু তিনি নন, তাঁদের পরিবারই পরম বৈষ্ণব। বাড়িতে রয়েছে জগন্নাথ বিগ্রহ। নিত্য পূজা হয় তার। সাধু, বৈষ্ণব, ভক্ত পেলে কথা নেই বলরাম তাঁদের সঙ্গেই কথায় কথায় কাটিয়ে দেন দিন। তাঁদের সেবার জন্য অকাতরে দেন সব কিছু। ফলে বিষয়-আশয়ের দিকে নজর দেবার মত সময় কোথায় তাঁর।

বলরামের অবস্থা দেখে পরিবারের লোকজন ভাবনায় পড়েন। এমন করলে যে জমিদারি রাখাই দায় হবে? এমন লোক শেষে সংসার চালাবে কেমন করে? বলরামকে ভক্তসঙ্গচ্যুত করার কথা ভাবেন তাঁরা।

এমন সময় বলরামের মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়। মেয়ের বিয়ের জন্য বলরাম আসেন কলকাতায়। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর খুড়তুতো ভাই কটকের বিখ্যাত উকিল হরিবল্লভ বসু বাগবাজারের ৫৫ নম্বর রামকান্ত বসু লেনের বাড়িটি কেনেন। সেই বাড়িতেই থাকতে বললেন তিনি বলরামকে। জগন্নাথ দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার বেদনায় প্রথমটায় গররাজি হলেও বলরাম বসু কলকাতাতেই থেকে যান। জমিদারি দেখার ভার পড়ে খুড়তুতো ভাই নিমাই-চরণ বসুর ওপর।

জগন্নাথ অদর্শনের বেদনা অবশ্য বেশিদিন সইতে হ'ল না বলরামকে। দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনি ঠাকুরকে দেখলেন, তাঁর মধ্যেই পেলেন তাঁর জগন্নাথকে। সব বেদনা ভুলে নতুন আশায়, পরম প্রাপ্তির আনন্দে বলরাম মনপ্রাণ সবই সমর্পণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

এ তো সামান্য পাওয়া নয়, এ যে পরম পাওয়া। এ প্রাপ্তির আনন্দ তো একা একা ভোগ করে সুখ নেই। এ আনন্দের স্বাদ পরিবার পরিজনকে দিতে না পারলে তৃপ্তি কোথায়? তাই বলরাম তাঁর স্ত্রী পুত্র এবং পরিবারের অন্যান্যদেরও নিয়ে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে। কলকাতায় বলরাম ভবন হ'ল 'শ্রীরামকৃষ্ণের ফৌজে'র কেল্লা। কলকাতায় এলে একমাত্র এখানেই রাত কাটাতেন ঠাকুর। আর শ্রীক্ষেত্রচ্যুত বলরাম এই নতুন তীর্থে তাঁর পরমকে পেয়ে হলেন আপ্তকাম।

ব্যাপারটা কিন্তু তাঁর অন্য আত্মীয়স্বজনের ভাল লাগল না। তাঁরা পরম-বৈষ্ণব, রাধাকৃষ্ণই তাঁদের একমাত্র উপাস্য। অথচ বলরাম এমন একজনের আশ্রয় নিয়েছেন, যিনি বলেন, যত মত তত পথ। যিনি মানেন সবাইকেই, আবার শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসান না কাউকেই। তাছাড়া বলরাম যাচ্ছে যাক, বাড়ির মেয়েদের কেন নিয়ে যাচ্ছে? না, না, এটা তাঁদের পরিবারের পক্ষে তেমন শোভন হচ্ছে না।

নানাভাবে অভিযোগ অনুযোগ এসে পৌঁছয় হরিবল্লভ আর নিমাইচরণের কাছেও। তাঁরাও সব কিছু খোঁজ না নিয়ে একটু বিরক্তই হন বলরামের ওপর। তাঁদের ধারণা, বলরাম চিরকালই একটু ভক্তপাগল, সহজ সরল। সবাই তাঁকে ঠকাবার জন্য চারিদিকে ফাঁদ পেতে বসে আছে। কি জানি তেমন কোন লোকের পাল্লায় যদি পড়ে থাকে বলরাম?

বিরক্তির বাণী বয়ে নিয়ে এল চিঠি। সে চিঠি পেয়ে বলরাম ক্ষুব্ধ হন, আবার ভাবেন বিনা সাধনায় কি পাওয়া যায় তাঁকে? তাঁকে পাওয়ার জন্যই হাসিমুখে সহ্য করতে হবে এসব। যদি পারেন, তবেই তো তাঁকে পাওয়া যাবে চিরতরে। তাই বলরাম তাঁর কাজ করে যান একই ভাবে। হরিবল্লভকে শুধু চিঠি লেখেন, না হয়, একবার দেখেই যাও না, কার আশ্রয়ে আছি আমি?

সে চিঠি পেয়ে হরিবল্লভ ঠিকই করলেন, না, আর নয়, কলকাতাতেই যাবেন তিনি। পরের মুখে ঝাল খাওয়া আর নয়। এবার নিজের চোখে দেখবেন সব। চিঠি লিখলেন, কলকাতায় যাচ্ছেন তিনি।

সে চিঠি পেয়ে বলরাম কিন্তু একটু ভাবনাতেই পরলেন। কি জানি, যদি তাঁর ভাল না লাগে ঠাকুরকে। যদি আবার জোর করে তাঁকে নিয়ে যান পুরীতে। তাহলে আবার যে বঞ্চিত হবেন তাঁর ঠাকুরের সঙ্গসুখ থেকে।

ভাবনা যাই হোক, বলরাম হরিবল্লভের থাকার জন্য সব আয়োজনই করলেন ঠিক ঠিক ভাবে। একদিন এলেন হরিবল্লভ।

বলরামের দুর্ভাবনাটা কিন্তু বাড়ল সেদিনই। কি জানি কি হয়? যদি ওর পছন্দ না হয়—তবে কি হবে? এই 'কি হবে'র ভাবনাতেই কৃশ বলরামের মুখের ওপর যেন ঘনিয়ে এল চিন্তার কালো মেঘ। সেদিন শ্যামপুকুরে ঠাকুরের কাছে যেতেই তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি গো, কি হয়েছে, মুখটি অমন কালো কেন?

বলরাম জানালেন তাঁর ভাবনার কথা। শুনে হেসে ঠাকুর বললেন, তা তাকে একবার এখানে নিয়ে এসো না। তাহলেই দেখবে।

হরিবল্লভ নিজেই আসতে চান। কিন্তু ভরসা পাচ্ছেন না বলরামই তাঁকে আনতে। তাঁর সেই দোমনা ভাব দেখে গিরিশ ঘোষ বলেন, ভাবনা কি? হরি আমার সহপাঠী। আমি নিয়ে আসব তাকে। এমনি তো ভক্ত মানুষ, তবে একটু 'কানপাতলা'। তা কি হয়েছে আমিই নিয়ে আসব তাকে।

সে কথায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হন বলরাম। গিরিশ ঘোষ যদি তাঁকে নিয়ে আসে তবে আর টঁ্যা-ফুঁ করতে হবে না হরিবল্লভকে।

কথা ঠিক করে গিরিশ ঘোষ বিকেল বেলায় নিয়ে এলেন হরিবল্লভকে। গিরিশের সঙ্গে হরিবল্লভও প্রণাম করলেন ঠাকুরকে।

পরিচয়ের পর্বটা সারলেন গিরিশ ঘোষই। বললেন, কটকের বড় উকিল হরিবল্লভ বসু। আমার সহপাঠী। মস্ত লোক। আপনাকে দর্শন করতে এসেছে।

এসো-এসো, বোসো। তোমার কথা অনেক শুনেছি, তোমাকে দেখার ভারি ইচ্ছে হোত। আবার ভয়ও করত।

ঠাকুরের কথায় হরিবল্লভও হাসিমুখেই পাল্টা প্রশ্ন ছোঁড়েন, কেন, ভয় করত কেন?

কি জানি যদি তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়।

বন্ধুর হয়ে গিরিশ ঘোষই বলেন, তা এখন কি দেখলেন?

দেখলুম তা নয়, খুব ভাল। বালকের মত সরল। কেমন চোখ দেখেছ? অন্তর যদি ভক্তিতে ভরা না হয় তবে অমন চোখ হয় না। বলতে বলতে ঠাকুর হরিবল্লভকে স্পর্শ করে বলেন, হঁ্যা গো, ভয় করা দূরে থাকুক, তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে।

সেটা আপনার কৃপা। হরিবল্লভের সে কথার পর ঠাকুর অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন, হরিবল্লভ যেন মস্ত লোক এই ভাব দেখিয়ে বললেন, আচ্ছা, আমার এই ব্যামো কি করে ভাল হবে?—তুমি কি দেখছো, খুব শক্ত ব্যামো?

কুণ্ঠার স্বরে হরিবল্লভ বলেন, আজ্ঞে সে সব ডাক্তাররা বলতে পারবেন।

তাই না? বেশ, ঠাকুরের কথা যেন ক্রমেই এলোমেলো হয়ে যায়। একটা ভাবতরঙ্গে ভাসতে থাকেন তিনি। কণ্ঠ যেন একটু স্তিমিত। চোখ ঢুলুঢুলু। সেই অবস্থাতেই তিনি বলেন, দেখ মেয়েরা পায়ের ধুলো নেয়, তা ভাবি, একরূপে

তিনিই—মানে ঈশ্বরই তো এর ভিতরে আছেন—সে প্রণাম তাঁকেই। এমনি একটা হিসেব আনি।

সে কথায় তাড়াতাড়ি হরিবল্লভ বলেন, না, না, আপনি সাধু, আপনাকে লোকে প্রণাম করবে তাতে দোষের কি ?

না, না, আমি কি ? সে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল এবং কেউ হলে হোত। আমি কি, তা তুমি আবার আসবে।

আজ্ঞে আপনার টানেই আসবো। আপনি বলছেন কেন ?

বেশ, বেশ। বড ভাল লাগল। এরপর ঈশ্বর প্রসঙ্গ নিয়ে আরো কিছু কথা হ'ল। তারপর হরিবল্লভ বললেন, এবার আমি আসি ?

এসো -আবার এসো।

হরিবল্লভ যাবার আগে প্রণাম করে ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিতে যান। ঠাকুর পা সরিয়ে নেন। হরিবল্লভ কিন্তু তাতে নিরস্ত হন না। বরং জোর করে পায়ের ধুলো নেন। তারপর তিনি উঠে দাঁড়াতে তাঁকে খাতির করবার জন্যই যেন ঠাকুরও উঠে দাঁড়ান। হরিবল্লভ যাবেন এমন সময় ঠাকুর বলেন, বলরাম অনেক দুঃখ করে। আমি মনে করলাম, একদিন যাই—গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হ'ল। পাছে তোমরা বল, একে আবার কে আনলে ?

হরিবল্লভ শশব্যস্তে বলেন, ওসব কথা কে বলেছে ? ওসব নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না।

তাহলে বলরাম আঘাটায় পড়েনি তো ?

ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন, শুধু তার নয়, আমাদেরও পরম সৌভাগ্য যে আপনি তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আবার প্রণাম করে বিদায় নেন হরিবল্লভ। যে মন নিয়েই আসুন না কেন, ফিরে গেলেন তিনি অন্য মানুষ হয়ে, পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে।

তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বলেন মাস্টারকে, ভক্তি আছে, না হলে জোর করে পায়ের ধুলো নিল কেন ? সেই যে সেদিন তোমায় বলে-ছিলুম, ভাবে দেখলুম ডাক্তার ও আর একজনকে—এই সেই আরেকজন। তাই দেখ এসেছে।

মাস্টার বলেন, আজ্ঞে আসবেই, ভক্তির ঘর যে।

ঠিক বলেছ, ভক্তির ঘর, ওগো, শুধু ও নয়, আসবে—সবাই আসবে এখানে।

তিনি অভয়, অদ্বয়, তিনিই অক্ষর।

এবার তাঁর আগমন ভক্ত রক্ষায়। ভক্ত প্রতিষ্ঠায়। তাঁর সেই বরাভয় রূপে তাই তিনি দিলেন দেখা এই শ্যামপুকুরেই। জানিয়ে দিলেন, তিনি আছেন, থাকবেন ভক্তভয় হরণে।

কার্তিক মাস। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসনা—কালীমূর্তি এনে পূজা হোক এবার এই শ্যামপুকুরে। কিন্তু ভয়, পূজার সেই ধকল কি ঠাকুর তাঁর এই ভগ্ন শরীরে সইতে পারবেন?

শুধু তিনি নন, সব ভক্তেরই একই আশঙ্কা। তাই মনের বাসনা তাঁরা চেপে রাখেন মনেই। মানসোপচারে আপন হৃদি মন্দিরে দেবীপূজার সঙ্কল্প নেন তাঁরা।

কিন্তু যিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—যাঁর আবির্ভাবই ভক্তের ডাকে—ভক্তের ইচ্ছা-পূরণে—ভক্তের জন্য—তিনি কি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন ভক্তের ডাকে? পারেন না, এটা সত্য, শাশ্বত।

তাই কালীপুজোর আগের দিন হঠাৎই বললেন ঠাকুর, কাল কালীপুজো। এখানে একটু পুজো করলে বেশ হয়।

এ কি ঠাকুরের ইচ্ছে, না কি এ ভক্তদেরই ইচ্ছের প্রকাশ ঠাকুরের কণ্ঠ দিয়ে। ব্যাপারটা যাই হোক, ঠাকুরের এই ইচ্ছার প্রকাশে উৎফুল্ল হ'ল ভক্তহৃদয় শুরু হয় উদ্যোগ আয়োজন। আয়োজনের মুখেই কিন্তু ওঠে জিজ্ঞাসা, পুজো হবে কি করে? মূর্তি এনে, না পটে? পঞ্চোপচার না ষোড়শোপচারে?

ভক্তরা সে জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন না সেদিন। না, জিজ্ঞাসা তাঁরা করেননি, আর ঠাকুর নিজেও বললেন না একটি কথা। পুজো বাদ দিয়ে অনেক কথা নিয়েই আলোচনা হ'ল, কিন্তু পুজো নিয়ে আলাদা কোন আলোচনার কোন সুযোগই হ'ল না।

পুজোর দিন সকাল। ঠাকুরের পরনে গরদের কাপড়। কপালে চন্দনের টিপ। তিনি অপেক্ষা করছেন মাস্টারের জন্য।

আগের দিনই তিনি মাস্টারকে বলেছিলেন, ঠনঠনিয়ায় সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজো দিতে। আর বলেছিলেন রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তর গানের দু'টি বই আনতে।

কালীপুজোর সেই প্রসাদ আর বই দু'টির জন্য অপেক্ষা করছেন ঠাকুর। বেলা তখন প্রায় ৯টা। মাস্টার কালীর পুজো দিয়ে সেই ঠনঠনিয়া থেকেই খালি পায়ে প্রসাদ নিয়ে এসেছেন।

মাস্টারকে দেখেই ঠাকুর চটি জুতোটা খুলে এগিয়ে গেলেন মাস্টারের দিকে। বললেন, এনেছ প্রসাদ, দাও। প্রসাদ নিয়ে ঠাকুর প্রথমে ঠেকালেন মাথায় তারপর মুখে দিলেন একটু। পরে বাকি প্রসাদ সবাইকে দিয়ে দিতে বললেন।

সেদিনের সেই ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে ঠাকুর তাঁর উত্তর সাধকদের শিখিয়ে গেলেন, কেমন করে প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়। কতটা নিষ্ঠার প্রয়োজন প্রসাদের ব্যাপারে।

প্রসাদ দেবার পর মাস্টার বই দুটি বের করে ঠাকুরকে দিলেন। বললেন, এই যে রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তর বই।

ঠাকুর বই দু'টি নিয়ে বললেন, এ দু'টি ডাক্তারকে দিতে হবে। ওর মধ্যে 'মন কি তত্ত্ব কর, তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে', 'কে জানে কালী কেমন। ষড়দর্শনে না পায় দরশন', 'মনরে কৃষি কাজ জান না', 'আয় মন বেড়াতে যাবি' —ইত্যাদি গান ঢুকিয়ে দেবে কেমন?

মাস্টারের সঙ্গে পায়চারি করতে করতে ঠাকুর বলেন, এ গানটিও বেশ, 'এ সংসার ধোঁকার টাটি', আর 'এ সংসার মজার কুটি! ওভাই আনন্দবাজারে লুটি।'

কথা বলতে বলতেই ঠাকুরের শরীরে যেন এল হঠাৎ এক শিহরণ। সঙ্গে সঙ্গে আবার চটি জুতো খুলে স্থির ভাবে দাঁড়িয়েই হলেন সমাধিস্থ।

কালীপুজোর সেই দিনটিতে ঠাকুর এমনি ভাবে বারে বারেই হচ্ছিলেন সমাধিস্থ।

বেলা তখন আন্দাজ দু'টো। ঠাকুরের কাছে রয়েছেন গিরিশ, কালীপদ, নিরঞ্জন, রাখাল, মণীন্দ্র, লালু, মাস্টার ইত্যাদি আরো কয়েকজন। ডাক্তার সরকার এলেন ঠাকুরকে দেখতে?

ডাক্তারকে দেখেই ঠাকুর বললেন, কিগো, আজ কেমন দেখলে?

ভালই তো দেখলাম।

বেশ, বেশ, ভাল দেখলেই ভাল। শোন তোমার জন্য এই বই দুটি এনেছি।

ডাক্তার বই দু'খানি নেড়ে চেড়ে বললেন, শুধু বইয়ে তো হবে না। গান শোনাতে হবে।

গান শুনবে, ভালই তো। কই মাস্টার গাও না—ওই যে সকালে তোমাকে বললাম যে গানগুলো—সেইগুলো গাও।

মাস্টার গাইতে লাগলেন একটার পর একটা রামপ্রসাদী গান। তারি মধ্যে গিরিশকে ডাক্তার বললেন, তোমার ওই গানটি বেশ। ওই যে বুদ্ধচরিতের বীণার গান।

ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশ আর কালীপদ তখন শুরু করলেন,

"আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার।"

এরপর আরো কয়েকখানি গান গাইলেন তাঁরা। গাইতে গাইতে ভাবাবিষ্ট হলেন মণীন্দ্র, লাটু ও আরো এক আধজন। শেষ হ'ল গান। এবার আবার ডাক্তারের ডাক্তারি কথা। ডাক্তার শুনলেন আগের দিন প্রতাপ মজুমদারের কথায় দেওয়া হয়েছে নাকসভমিকা। শুনেই বিরক্ত ডাক্তার বলেন, আমি তো মরিনি, ওসব দেওয়া কেন?

ঠাকুর কথাটা শুনে হেসে বলেন, তোমার অবিদ্যা মরুক। কথাটা শুনে ডাক্তার অন্য অর্থ করলেন, বললেন, আমার কোন অবিদ্যা নেই। ঠাকুর বলেন, না সেকথা বলিনি, বলছি,—সন্ন্যাসীর অবিদ্যা মা মরে যায় আর বিবেক সন্তান হয় অবিদ্যা মা মরে গেলে অশৌচ হয়। তাই সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নেই।

ঠাকুর সেই যে আগের দিন বলেছিলেন, পুজোর উপকরণ সব জোগাড় করে রাখিস, কাল কালীপুজো হবে, ব্যস তারপর থেকে একদম চুপ। পুজো সম্পর্কে কোন কথাই আর বলেন না।

ঠাকুরের কাছ থেকে আর কোন নির্দেশ না পেয়ে ভক্তেরা বুঝতে পারেন না, তাঁরা কি করবেন? অন্যদিকে পুজোর হুল্লোড়ে ঠাকুর যদি আবার আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন এই আশঙ্কায় নিজের থেকেও তাঁরা কিছু বলেন না।

ভক্তের মধ্যে একটা উসখুস ভাব। মোটামুটি ভাবে তাঁরা ফুল চন্দন, বেলপাতা, ধূপ ধুনো কিছু ফলমূল মিষ্টি জোগাড় করে রেখেছেন। কিন্তু কোথায় পুজো হবে, উপকরণই বা কোথায় রাখা হবে, পুজোই বা কেমন ভাবে হবে তা তাঁরা বুঝতে পারেন না।

এদিকে এক সময় বিকেলের সূর্য বসে পাটে। সন্ধ্যা নামে গাঢ় হয়ে। বাড়িতে বাড়িতে জ্বলে ওঠে প্রদীপমালা। বাজির আওয়াজ, তুবড়ির ফুল,

ছোটদের কমবেশি চিৎকার। দূরের মণ্ডপ থেকে ঢাকের আওয়াজ সব মিলিয়ে বারেবারেই স্মরণে আসে, আজ কালীপুজো।

দেখতে দেখতে সাতটা বেজে যায়। ঠাকুর কিন্তু তখনও চুপচাপ। তাঁকে ঘিরে ঘরের মধ্যে রয়েছেন শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাস্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি জনা ত্রিশ ভক্ত। ঠাকুরকে ওই রকম নির্বিকার ভাবে থাকতে দেখে ভক্তের দল সেই ঘরেরই পুব দিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে একে একে সাজাতে থাকেন নানারকম ফুল, বেলপাতা, চন্দন, জবা, মিষ্টি প্রভৃতি। তবু ঠাকুর নিশ্চুপ।

ভক্তরা কেউ কেউ ভাবেন, দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় তো ঠাকুর অনেক সময়ই দেহমনকে দৈবী প্রতীক হিসেবে বরণ করে নিজেই নিজের মাথায় গায়ে দিতেন ফুল চন্দন। করতেন নিজেকে পুজো। এবার এখানেও কি সেই ভাবেই সারবেন পুজো? জগদম্বাজ্ঞানে করবেন আত্মপুজো। তাঁদের কি আবার তাহলে সেই ভাগ্য হবে সে পুজো দেখার? এমনি নানা ভাবনায় দোলেন তাঁরা। ঠাকুরকে ঘিরে বসে তাঁরা শুধুই তখন মা জগদম্বার চিন্তায় মগ্ন।

এরি মধ্যে ধুনো জ্বালান হ'ল। ঠাকুর সেই ভাবেই বসে যেন নিবেদন করলেন সব। তারপর বললেন, একটু সবাই ধ্যান কর। ঠাকুরের কথায় শুরু হ'ল ধ্যান।

গিরিশ ঘোষ কিন্তু তখন অন্যভাবে ভাবিত। তিনি দেখলেন, ঠাকুর মাতৃজ্ঞানে আত্মপুজো করলেন না। করলেন না অন্য কোন ভাবেও পুজো। অথচ তিনি বলেছিলেন, কাল কালীপুজো। পুজো হবে। সে কেমন পুজো? সে কি এই ভাবে, না অন্য কোন ভাবে?

প্রশ্নের চোরাগলিতে ঘুরতে ঘুরতে গিরিশ ঘোষ ভাবলেন, ঠাকুরের তো আর কোন রকম পুজোরই দরকার নেই, এখন যে তিনিই সব। তাই কি ভক্তরা এই জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পুজো করে ধন্য হোক এটাই তিনি চান। তারি জন্য এই আয়োজন?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে এল একটা আবেশ। দেখা দিল সারা অঙ্গে রোমাঞ্চ। তিনি সোজা হয়ে স্থির ভাবে বসলেন। তারপর সামনের টাট থেকে ফুল বেলপাতা আর চন্দন নিয়ে 'জয় মা' বলে দিলেন ঠাকুরের পায়।

ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর হলেন সমাধিস্থ। সারা

দেহ তখন তাঁর জ্যোতির্ময়। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে এক দিব্য হাসি। দুই হাতে তাঁর বরাভয় মুদ্রা। উত্তর মুখে বসে আছেন ঠাকুর, ভক্ত ভৈরব গিরিশ বারবার ঠাকুরের পায় দিচ্ছেন পুষ্পাঞ্জলি। সেই মুহূর্তে সবাই যেন দেখলেন, ঠাকুরের শরীরেই আবির্ভূতা হয়েছেন স্বয়ং জগজ্জননী।

সেই অবস্থায় নিরঞ্জনও ফুল নিয়ে দিলেন ঠাকুরের পায়। ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী বলে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। মুখ মাথা ঘষতে লাগলেন ঠাকুরের পায়। ভক্ত কণ্ঠে বলে উঠল আবার—জয় মা—জয় মা। চারিদিকে সে এক দিব্য ভাবের প্রকাশ। সাক্ষাৎ জীবন্ত দেবী প্রতিমাকে পেয়ে ভক্তরা প্রাণের আবেগে করে চলেন স্তব। গেয়ে যান গান। কখনও একক, কখনও বা সমবেত ভাবে।

গিরিশ গেয়ে উঠলেন,

কেরে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কেরে রক্তোৎপল চরণযুগল হর উরসে বিরাজে॥
কেরে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কতপদে প্রকাশ।
মৃদু মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন গরজে॥

এক গান থামতে না থামতেই অন্য গান। গানের মালায় মালায় সাজাতে থাকেন যেন তাঁরা ওই চিন্ময়ী দেব বিগ্রহকে।

উঠছে গান,

ত্বং হি কালী তারা পরমাকৃতি
ত্বং হি মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি
ত্বং হি স্থল জল অনল অনিল
ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।

গিরিশের গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিহারী গান,

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি—

সে গানের পরে মণি গেয়ে ওঠেন,

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—

তারপর গানে গানে চলে ঠাকুরের আরতি। বেশ কিছুক্ষণ পর ঠাকুর আস্তে আস্তে ফিরে আসেন স্ব-ভাবে। মুখে তখনও তাঁর সেই সুধাঝরা হাসি। সামনে সাজানো মিষ্টি পায়েস থেকে আলতো ভাবে আঙুলে করে তুলে নেন তিনি একটু। তারপর তা জিভে ঠেকিয়ে প্রসাদ করে দেন সব।

ভক্তেরা তাঁকে একে একে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে এলেন বৈঠকখানায়। পরমানন্দে সেইখানে বসে তাঁরা প্রসাদ খেতে থাকেন আর ঠাকুরের অহেতুকী করুণার কথা স্মরণ করে পুলকে রোমাঞ্চিত হতে থাকেন। তাঁরা যে 'দেবরক্ষিত' ঠাকুর আজ সেই কথাটাই তাঁদের এমনি ভাবে বুঝিয়ে দিলেন দেখে তাঁরা আনন্দে আজ ভরপুর।

দেখতে দেখতে রাত ৯টা বেজে গেল। ঠাকুর এবার ওপর থেকে বলে পাঠালেন, রাত হয়েছে। সুরেন্দ্রর বাড়িতে আজ কালীপুজো। সেখানে তোমাদের নিমন্ত্রণ, যাও সব সেখানে যাও।

ঠাকুরের আদেশে পুর্ণ হৃদয়ে ভক্তের দল চললেন সুরেন্দ্রর বাড়ি। সেদিনের সেই ঘটনার অমৃতময় স্মৃতি নিয়ে শ্যামপুকুর বাটীও হ'ল অমৃতত্বের অধিকারী।

এই শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের হ'ল এক অদ্ভুত দর্শন। একদিন তিনি দেখলেন, তাঁর স্থূল শরীর থেকে বাইরে চলে এল তাঁরই সূক্ষ্ম শরীর।

কৌতুক রঙ্গে দেখছেন ঠাকুর, সেই সূক্ষ্ম শরীর তাঁরই সামনে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে ঘরের মধ্যে। সে চলাফেরা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু—

অবাক ঠাকুর দেখেন সেই সূক্ষ্ম শরীরেও গলার সংযোগস্থলে পেছন দিকে রয়েছে কতকগুলি ক্ষত। সে ক্ষত দেখে ঠাকুর ভাবছেন তাই তো ওখানে ক্ষত হ'ল কোথা থেকে? কোথা থেকে ক্ষত হ'ল ঠাকুর ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না বলেই সম্ভবত আবির্ভূতা হলেন জগজ্জননী।

দিব্যজ্যোতিতে ভরে গেল ঘর। ভুবন ভোলানো রূপ নিয়ে আবির্ভূতা হয়ে মা বললেন, ওরে আর পাপ নিবি? কে কোথায় কি করে আসছে, কত রকমের পাপ তারপর তোকে ছুঁয়ে তারা হচ্ছে পাপমুক্ত, পবিত্র।

কিন্তু তোকে ছুঁয়ে তারা পাপমুক্ত হলেও পাপের তো আর বিনাশ হচ্ছে না। পাপ এসে আশ্রয় নিচ্ছে তোর দেহে। সেই পাপেরই সংক্রমণ ওই রোগ।

মা'র সে কথায় ঠাকুর কিন্তু হলেন উৎফুল্ল। হবেন নাই বা কেন? পাপ-বিমোচনেই যে তাঁর আবির্ভাব। সে আবির্ভাব যে সার্থক হয়েছে এই ভাবনাতেই তাঁর আনন্দ আর সেই আনন্দেই ওই রোগযন্ত্রণাময় দেহেও তিনি আরও আরও লোককে করলেন কলুষমুক্ত। আরও করুণা বিতরণের জন্যই যেন তিনি করলেন স্থান-বদল। লীলাস্থল শ্যামপুকুর থেকে স্থানান্তরিত হ'ল কাশীপুরে। কৃষ্ণধাম থেকে শিবপুরীতে।

এ আমায় কোন বদ্ধ জায়গায় আনলি মা। চারদিকে শুধু ইটপাথরের বাড়ি। সবুজ নেই। নেই আকাশের নীল। অনিলও এখানে যেন বড় অমিল। এমন জায়গায় যে হাঁপিয়ে উঠছি।

ডাক্তাররাও বললেন তাই। না, এখানে নয়, চাই মুক্ত বায়ু, উন্মুক্ত আকাশ—প্রকৃতির সজীবতা। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে বড় ভিড়। রোগীর যেখানে প্রয়োজন বেশি করে বিশ্রাম—কথা খরচে যেখানে হতে হবে অতিমাত্রায় মিতব্যয়ী—সেখানে অহোরাত্র চলছে কথার মালা গাঁথা। না, না, বন্ধ কর এসব। নিয়ে যাও ঠাকুরকে কোন নির্জনে, প্রকৃতির অঙ্গনে।

কিন্তু কোথায় সে রকম স্থান? যেখানে আছে সবুজ, আছে উদার আকাশ—অথচ যে জায়গা হবে কলকাতার কোলাহলমুক্ত। ভক্তের দল সন্ধান করতে থাকেন সে রকম বাড়ির।

সামনে পৌষ মাস। সে সময় তো ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া যাবে না অন্য কোথাও। তাই তাড়াতাড়ি একটা আস্তানা খুঁজে বের কর।

ঠাকুরের জন্য নতুন বাড়ি চাই। চারিদিকে চলে গেল বার্তা। খবরও পাওয়া গেল অল্পদিনের মধ্যেই। কাশীপুর চৌরাস্তা থেকে একটু দূরেই মতিঝিল। তারই সামান্য উত্তরে একটি বিরাট বাগানবাড়ি। খালি অবস্থাতেই পড়ে আছে সেটি। সে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে এমন একটি খবর পেলেন ভক্তেরা।

বাড়ির মালিক লালাবাবুর জামাই গোপালচন্দ্র ঘোষ। ভক্তের দল গেলেন গোপাল ঘোষের কাছে। সব শুনে তিনি একটু চুপ করে রইলেন। বোধহয় ভাবছিলেন ছেলে-ছোকরার দল ভাড়া চাইছে তাদের গুরুদেবের জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাড়া দেবে তো? দিতে পারবে তো?

গোপাল ঘোষের মনের ভাব যেন বুঝলেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। চাকুরে সুরেন মিত্র এগিয়ে এসে বললেন, আমি ভাড়া নেব বাড়ি। আমার সঙ্গেই চুক্তি হোক।

গোপাল ঘোষ এবার আর আপত্তি করার কিছু পেলেন না। সুরেন মিত্র সিমলার এক বনেদী পরিবারের ছেলে। নিজেও কাজ করেন বড় সাহেবী কোম্পানিতে। তাই তাঁকে ভাড়া দিতে কোন আপত্তি করা যায় না।

ভাড়া ঠিক হ'ল মাসিক ৮০ টাকা। প্রথমে ছয় মাসের জন্য পরে আরো তিন মাসের জন্য ভাড়ার চুক্তি করা হ'ল।

আন্দাজ ১৪ বিঘের ওপর এই বাগানবাড়ি। পরিচিতি এর কাশীপুর উদ্যান-বাটী হিসেবেই। বাগানের উত্তর দিকে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় দোতলা বাড়ি। নিচে চারখানা আর ওপরে দু'খানা ঘর। নিচে মাঝখানের ঘরটি ছিল বড়। পশ্চিমের ছোট ঘরটি থেকে উঠে গেছে দোতালায় যাবার কাঠের সিঁড়ি। দোতলাতে বড় একটা হলঘর, একটা ছোট ঘর।

একতলাতে পুবদিকের ঘরে থাকতেন মা সারদামণি আর হলঘর ও দক্ষিণের ঘরে থাকতেন ঠাকুরের ভক্ত সেবকের দল। দোতলার বড় হলঘরটি ছিল ঠাকুরের থাকার ঘর। বাগানের মধ্যে ছিল একটি ডোবা আর একটি ছোট পুকুর। গাছগাছালিতে ভরা ছিল বাগান। সব মিলিয়ে বাগানটি ছিল এক রমণীয় স্থান।

১৮৮৫ সালের ১১ ডিসেম্বর শ্যামপুকুর বাটী থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এসে ঠাকুর যেন হলেন আনন্দময়। বাগবাজার থেকে খুব দূরে নয়, আবার দক্ষিণেশ্বরও খুবই কাছে। তাই একদিকে ভক্তদের আসার যেমন অসুবিধে নেই তেমনি দক্ষিণেশ্বর যেতেও কোন বাধা নেই।

ভক্তদের ভাল লেগেছে, তাদের সুবিধে হবে ভেবেই ভাল লাগল জায়গাটা ঠাকুরেরও।

জায়গাটা ভাল লাগলেও শরীর কিন্তু তেমন ভাল হ'ল না। বরং যত দিন যায়, ততই যেন শুকিয়ে যেতে থাকেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ প্রতিদিনই যেন ক্ষয় হতে থাকে। দেহের যত ক্ষয় হয় মনের যেন ততই প্রসার হয়। কোথায় কোন কোণে কে পড়ে আছে তাকেও কৃপা করার জন্যও তিনিই যেন চঞ্চল হয়ে পড়েন। তাঁর তখনকার ভাব, ওরে কে কোথায় আছিস আয়, নিয়ে যা ভবপারাবারের পাথেয়। ওরে সময় যে আর নেই।

সর্বস্ব দান করার সেই সুদৃঢ় সঙ্কল্পের মুখে তাঁর দেহ যখন যন্ত্রণার বাণে বাণে হচ্ছে বিদ্ধ তখনও তাঁর মুখে অম্লান সেই হাসিটি।

শত যন্ত্রণার মাঝেও তিনি অটল-অচল স্থির। কিন্তু ভক্ত যাঁরা তাঁরা বিচলিত। ঠাকুরের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে তাঁদের। কেন, কেন তাঁদের ঠাকুর ভোগ করবেন এই যন্ত্রণা? কেন তোমার ঠাকুরের এই কষ্ট?

কেন আবার? এ যে পাপের ফল। তোমাদের সবার পাপ গ্রহণ করে ওই পাপপুরুষের আঘাত সইতে হচ্ছে এখন।

কিন্তু ঠাকুরের ওই যন্ত্রণা—ও যে আর সহ্য করা যায় না।

নরেন ছুটে যায় বাগানে। রাম-রাম করতে করতে সে উন্মত্তের মত ঘুরতে থাকে বাগানে।

ঠাকুর, নরেন বুঝি পাগল হয়ে গেছে।

ওরে ডাক, ডাক, শীগগির ওকে নিয়ে আয় এখানে।

না, আমি যাব না, কেন যাব? আজ আমি দেখব নামের কত জোর?

নরেন অবিরাম ছুটে যায় রাম রাম করতে করতে। সেই সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়েছে। মাঝরাত পার হয়ে বুঝি যায় রাতের শেষ প্রহরও। রাম নামের হুঙ্কার এখন কেমন যেন একটা বুকফাটা কান্নায় রূপান্তরিত।

সে কান্না সহ্য করা যায় না। দোতলার ঘর থেকে বলে ওঠেন ঠাকুর, ওরে তোরা কেউ যা না, ডেকে নিয়ে আয় আমার নরেনকে।

ও যে আসবে না।

না আসে জোর করে ধরে নিয়ে আয়।

না, ওগো না, আমি যাব না। আমি দেখব এই রাম নামের জোর। আমি যে সহ্য করতে পারছি না আমার ঠাকুরের এই যন্ত্রণা।

নাম ব্রহ্ম। সেই নামব্রহ্মের চৈতন্য ঘটিয়ে আমি নির্মূল করব ঠাকুরের ব্যাধি।

সে তো করবে। কিন্তু ঠাকুর যে ডাকছে।

ডাকুক। আজ আমি থামব না কিছুতেই।

তাও কখনও হয়। আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। শুধু বলা নয়, জোর করে নিয়ে যেতে হ'ল নরেনকে ঠাকুরের কাছে।

নরেনকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, ওরে অমন করছিস কেন? তুই অমন করলে যে আমি স্থির থাকতে পারি না।

আমিও যে স্থির থাকতে পারছি না তোমার কষ্ট দেখে। তাই তো ঠিক করেছি নামব্রহ্মর চৈতন্য ঘটিয়ে ভাল করব তোমাকে।

ওরে আমিও যে একদিন ছুটেছি তোরই মত। এক আধদিন নয়, বারোটা বছর। আর তুই কি একদিনেই তাই করতে চাস। যা শান্ত হ' বাবা, ঘরে যা, ঠাণ্ডা হ' এবার।

নরেন থমকে যায়। সেই প্রচণ্ড উন্মাদনা মুহূর্তে যেন নিস্তেজ। তবে কি

ঠাকুর আর থাকবেন না, এটাই নিশ্চিত। তাই নামব্রহ্মকে অস্বীকার না করেও তাঁকে স্থির থাকার জন্য ওই নির্দেশ।

না, নরেন সে নির্দেশকে অমান্য করতে পারলেন না। পারবেন কি করে? তা অমান্য করলে যে অস্বীকার করতে হয় তাঁকেই। তাই নামের জোরে তাঁকে ভাল করার সঙ্কল্প নিলেও মাঝপথেই থামতে হয় নরেন্দ্রনাথকে।

না থেমে উপায় কি? যিনি সবকিছুর নিয়ন্তা, তিনিই যখন নিশ্চল করে দিচ্ছেন, তখন তো থামতেই হবে। যা অবশ্যম্ভাবী তাকে তো মেনে নিতেই হবে। বাইরের তিনি মিলিয়ে গেলেও ভেতরে তিনি যাতে থাকেন চিরজাগ্রত তারই সাধনা তো এবার করতে হবে। তবে আর মিথ্যে ছোটা কেন?

স্থিরই হলেন নরেন্দ্রনাথ। একদিনের উদ্যত ফণা নরেন্দ্রনাথ মাথা নত করলেন আবারও। আর তাঁর সেই রূপ দেখে ঠাকুর বললেন, যা—এবার ঠাণ্ডা হ'। এবার ঘরে যা।

এমনি একটা ভাব এসেছিল দুর্গাচরণেরও। গৃহীভক্ত দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরের কথাতেই পেতেছিলেন সংসার। কিন্তু সংসারে থেকেও তিনি ছিলেন সাধক। তাঁর ভাবখানা, ঠাকুর বলেছেন সংসার করতে, সংসার করছি। তিনি তো ভোগের মধ্যে ডুবে থাকতে বলেননি, তবে কেন ঘাঁটব সংসারের পাক। 'আমি রাধিব বাড়িব ব্যঞ্জন সাজাব, তবু হাড়ি ছোব না'—এ তো শুধু কথা নয়, এ হ'ল দুর্গাচরণের জীবনের সাধনা।

সুখটুকু ভোগ করব আমি আর আমার জন্য কষ্ট করবে অন্য কেউ? না, না, তা অসম্ভব। মুটেকে পয়সা দিয়েও তাই বোঝাটা তুলে নেন তিনি নিজের মাথায়।

তিনখানা ঘরের মধ্যে একটা মাত্র ভাল। অন্য দু'খানার এমন অবস্থা যে বর্ষার দিনে বাইরে যা জল পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি জল পড়ে ঘরের ভিতরে। এমনি এক বর্ষার দিনে ঘরে এল অতিথি। খাওয়া-দাওয়া তো হ'ল? এবার শুতে দেওয়া হবে কোথায়? স্ত্রী চায় স্বামীর দিকে।

দুর্গাচরণ নির্বিকার ভাবে বলেন, কেন, আমরা যে ঘরে শুই সেখানেই বিছানা পেতে দাও অতিথির। আমরা যাই পাশের ঘরে।

যেমন স্বামী তার তেমনি স্ত্রী। কোন কথা নয়, নয় কোন প্রতিবাদ। স্বামী বলেছেন, তাতে তিনি সুখ পাবেন তবে কেন কথার কচকচি। অতিথিকে নিজের ঘর ছেড়ে সারারাত বর্ষার জল মাথায় করে কাটান দুর্গাচরণ আর তাঁর স্ত্রী। ঠাকুরের নাম করতে করতে কেটে যায় সে দুঃখেরও রাত। দুর্গাচরণ যেন ঠাকুরের কৃপাতেই পান আরো আনন্দের স্বাদ।

সেই দুর্গাচরণ ঠাকুরের অসুখের কথা শুনেই ছুটে এসেছেন ঢাকা থেকে। শুনলেন ঠাকুর খেতে চেয়েছেন আমলকি। ভক্ত যাঁরা, সেবক যাঁরা, তাঁরা সবাই বলেন, এখন অসময়, এখন আমলকি কোথায় মিলবে ?

দুর্গাচরণ কিন্তু বলেন, ও মিলতেই হবে। ঠাকুরের যখন খাবার বাসনা হয়েছে আমলকি, তখন সময় অসময় নেই ফলতেই হবে আমলকি। তৃপ্ত করতে হবে ঠাকুরকে, তৃপ্তি পেতে হবে।

সবই তো বুঝলাম, তা বলে অসম্ভব কি সম্ভব হয় ? আমড়া গাছে কি ফলে আম ?

কেন ফলবে না ? সীতা উদ্ধারের সময় সাগরতীরে দাঁড়িয়ে স্বয়ং রামচন্দ্র ভেবেই আকুল। কেমন করে পার হবেন এই সাগর ?

কেন সেতু করে ?

সমুদ্রে সেতু ? কে গড়বে সে সেতু ?

কেন তুমি ?

আমি ? সে শক্তি কোথায় আমার। রামচন্দ্র সেদিন আকুল কণ্ঠেই বললেন, পাথর ভাসাব জলে সে যে আমার ক্ষমতার বাইরে।

কে বলল বাইরে ? জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছ তুমি, তোমার ইঙ্গিত না পেলে গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না, আর জলে পাথর ভাসাতে পারবে না তুমি ?

না, পারব না, পারি না।

পারতেই হবে তোমাকে। এই নাও পাথর, ফেল সাগরে।

ভক্তের কথায় পাথর তুলে নেন রাম। ফেলেন জলে। কিন্তু না, ভাসল না পাথর ডুবে গেল গভীর সাগর জলে। ডোবাই যে তার ধর্ম। রামচন্দ্র হতাশ ভাবে বললেন, দেখলে তো ?

দেখলাম। হেসেই বলে নল নীল প্রভৃতি বানরের দল। দেখলাম তোমার লীলা। তোমার লীলাতেই তোমার ফেলা পাথর ডুবল জলে, কিন্তু এই তোমার নাম লিখে ফেলছি পাথর, দেখি তোমার কত শক্তি, কেমন করে ডোবাও একে? না, ডুবল না পাথর। একের পর এক পাথর জলে ভেসে তৈরি হ'ল সেতু। রামচন্দ্র বানর সৈন্য নিয়ে পৌঁছোলেন লঙ্কায়।

সেই ত্রেতায় যা হয়েছিল সম্ভব, তা কি হবে না কলিতে। হতেই হবে। ঠাকুর যখন চেয়েছেন, তখন আমলকি হয়েছে, আমলকি মিলবেই।

অপরিসীম বিশ্বাস আর দৃঢ় ভক্তি নিয়ে দুর্গাচরণ বেরিয়ে পড়েন। একদিন যায়, দুদিন যায়। তিনদিনও গেল, দুর্গাচরণের দেখা নেই। তবে কি দুর্গাচরণ আবার ফিরে গেছেন ঢাকাতেই। ভুলে গেছেন ঠাকুরকে আমলকি খাওয়ানোর কথা?

তাই কখনও হয়। তিনদিন বাদে ফিরে এলেন দুর্গাচরণ। অস্নাত, অভুক্ত। এই তিনদিন ঘুরেছেন তিনি পাগলের মত—এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। খাওয়া সেখানে তুচ্ছ। ঠাকুরকে তাঁর বাসনা মত দিতে হবে আমলকি।

অঞ্জলি ভরে সেই আমলকি দুর্গাচরণ তুলে ধরলেন ঠাকুরের সামনে—এই নাও প্রভু, তোমার বাসনামত আমলকি আমি এনেছি। তুমি নাও, তৃপ্ত হও, ধন্য কর আমাকে।

ধন্য তো করবই। তোমাকে ধন্য করতেই যে অন্তরে জেগেছিল আমলকি খাবার বাসনা। ও তো রসনার তৃপ্তির জন্য নয়, ও যে অন্তরের তৃপ্তির জন্য। ভক্তকে তার সাধনার ফল দিতেই যে ওই ফলের বাসনা।

দুর্গাচরণের অঞ্জলি থেকে আমলকি তুলে নিয়েই ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ, তৃপ্তোঽহং—আমি তৃপ্ত—পরিতৃপ্ত। কিন্তু দুর্গাচরণ তোমার মুখ অমন শুকনো কেন? চুলই বা অমন রুক্ষ কেন?

হবে না কেন ঠাকুর, এই তিনদিন যে আমার কোনদিকে খেয়াল ছিল না। এই তিনদিন আমি যে পাগলের মত। দয়াল তুমি, তোমার দয়াতেই পেলাম এই আমলকি। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তোমার কৃপার অন্ত পাওয়া ভার।

তোমার তো তাহলে খাওয়া দাওয়া হয়নি।

শুধু আজ নয়। এই তিনদিনই।

ওরে কে আছিস, এখনি খেতে দে দুর্গাচরণকে।

ঠাকুরের নির্দেশে তাড়াতাড়ি খাবার আসন করে দেওয়া হ'ল দুর্গাচরণকে।

তিনদিন বাদে স্নান করে শ্রান্ত দুর্গাচরণ শান্তভাবে বসলেন খেতে। টেনে নিলেন ভাতের থালা।

টেনে নিয়ে আবার কিন্তু ঠেলে দিলেন সে থালা। কি হ'ল। তিনদিন বাদে খেতে বসেই খাদ্যে এ অনীহা কেন? সবাই তাকান দুর্গাচরণের দিকে।

আজ একাদশী না। একাদশীর দিনে ভাত খাব কেমন করে?

তাই তো, একাদশীতে অন্নগ্রহণ করেন না দুর্গাচরণ। তবে কি তিনদিন বাদে অন্নের সামনে বসেও তাঁকে বঞ্চিত থাকতে হবে অন্নের স্বাদ গ্রহণ থেকে? এই কি তার বিধি? এই কি তার সাধনার ফল?

তাই কখনও হয়? দুর্গাচরণ যে ঠাকুরের আশ্রিত—তিনি কি বঞ্চিত থাকতে পারেন কখনও? তাই যখনই শুনলেন ঠাকুর—অমনি বললেন শশীকে, ওরে এক কাজ কর—ভাতের থালাটা নিয়ে আয় তো।

সবাই অবাক। ভাতের থালা দিয়ে কি করবেন ঠাকুর। শশী কিন্তু কোন দ্বিধা না করেই নিয়ে আসেন ভাতের থালা। তুলে ধরেন তা ঠাকুরের সামনে।

ঠাকুর বিছানার ওপর বসেই দু আঙুলে করে তুলে নেন দু'টি অন্ন। জিভে স্পর্শ করেই তা রাখেন আবার ভাতের থালার ওপর। বলেন, যা এটা দিয়ে আয় দুর্গাচরণকে।

আর দুর্গাচরণ। দুর্গাচরণ এবার সব দ্বিধা, সব প্রশ্ন দূরে সরিয়ে মাথায় নেন সে ভাতের পাত্র। তারপর খেতে থাকেন আকণ্ঠ। শুধু অন্ন নয়, পাতাশুদ্ধ খেয়ে নেন তিনি। খাবেন না কেন, কৃপাতারণ ঠাকুর—প্রভু তাঁর আজ করুণায় বিগলিত হয়ে আপনি করে দিয়েছেন যে প্রসাদ—একাদশী বলে কি তাকে রাখা যায় দূরে। দুর্গাচরণের মত ভক্ত কি তা পারেন?

সেদিন দুর্গাচরণকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঠাকুর, আঃ শীতল হয়ে গেলুম। তোমাকে জড়িয়ে ধরে আজ আমি ঠাণ্ডা হলাম। জুড়িয়ে গেলাম অন্তরে বাহিরে। তুমি আমার শীতলমণি—হে দুর্গাচরণ—তুমি আমার দগ্ধ প্রাণের অমৃত।

সে কি কথা ঠাকুর? তুমি যে তাপহরণ। আমার, আমাদের পাপহরণ করেই যে তোমার এই যন্ত্রণা—এই তাপ। আবার আপন ইচ্ছায় আমায় স্পর্শ করে তোমার শান্তি। এতে তো আমার কোন কৃতিত্ব নেই, নেই কোন ভূমিকা। তোমার খেলায় আজ তুমি আমাকে সাথী করেছ সেই আনন্দেই মগ্ন আমি, ধন্য আমি।

ঠাকুর কথা বলছেন দুর্গাচরণের সঙ্গে। বলছেন, এই 'খোলটা' নিয়ে মা কি খেলাই খেলছেন। একবার বাজাচ্ছেন ডুং ডুং করে—হাঁক মারছেন—ওরে আয়, আয়, তোরা কে আছিস ভক্ত, কে আছিস সাধক—তোরা আয়—মেল এক জায়গায়—তোদের মিলনে গড়ে উঠুক একটা নতুন তীর্থ।

আবার কখনও বা বলছেন খোলটাকে—নে, নে—ওরে যেখানে যত পাপ আছে সব হরণ করে নে তুই, লুটে নে তুই।

আবার কখনও বা বলছেন, ওরে, প্রথম যখন তোর এই দিব্যানুভূতি হ'ল তখন জ্যোতিতে তোর দেহ করছে জলজল। বুক লাল হয়ে গেছে। তখন তুই বারবার বলেছিলি, মা তুমি প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও—ঢুকে যাও। তোর কথাতেই তো আমি রয়েছি এখন তোর ভেতরে। এখন যারা পোক তারা তোর এই ক্ষয়ে যাওয়া দেহটা দেখে পালাবে আর যারা ভক্ত তারা তোর দেহ নয়, তোকে পাবার জন্যই ভিড় করবে তোর চারিদিকে। তোকে ঘিরেই তারা গড়বে সঙ্ঘ। সেবার মধ্য দিয়েই করবে আত্মোৎসর্গ। তার মধ্য দিয়ে পাবে তারা 'মা'কে। তাই তো এই ফুটো খোলটাকে এখনও রেখেছি টিকিয়ে। কিন্তু বড় যন্ত্রণা। বড় জ্বালা।

ঠাকুরের সে কথায় যেন দুর্গাচরণের দু'চোখ ভরে জল আসে। প্রভু আমার, ঠাকুর, তুমি সবার পাপ গ্রহণ করে নিজে জ্বলছ সে পাপের জ্বালায়, অথচ আমি করতে পারছি না কিছুই তোমার। আমার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে?

বুঝি দুর্গাচরণের মনের ভাবটি বুঝেই ঠাকুর বলেন, হ্যাঁ গো, তুমি কোন ওষুধ জানো না, তুমি ভাল করতে পার না আমার অসুখ।

ঠাকুরের সেকথায় চমকে ওঠেন দুর্গাচরণ, সোজা তাকান ঠাকুরের চোখের দিকে। তারপর এক দৃঢ়প্রত্যয়ে স্থির হয়ে বলেন, হ্যাঁ পারি। আছে আমার কাছে ওষুধ।

ঠাকুর চেয়ে আছেন দুর্গাচরণের দিকে। দুর্গাচরণ লুটিয়ে পড়েন ঠাকুরের চরণে। টেনে নেন যেন তাঁর রাঙা চরণকমল। তারপর বুড়ো আঙুলটি মুখে নিতেই ঠাকুর সহসা যেন সচকিত হয়ে টেনে নেন পা। ঠেলে দেন দুর্গাচরণকে। বলেন, ওরে না, না। তোর ওষুধ আমি জানি। তাই এ জ্বালা আমি তোকে টেনে নিতে দেব না। তুই যা—সরে যা।

কান্নার তরঙ্গ তখন দুর্গাচরণের সারা দেহে। হ'ল না, দিলে না ঠাকুর—তুমি আমাকে চরম সেবাধিকার দিলে না। কৃপা করেও ঠেলে দিলে দূরে। আমি পাপী—মহাপাপী তাই কি তোমার এই বঞ্চনা?

কি বললে পাপ? গিরিশের পাপ—সবার পাপ গ্রহণ করে তোমার এই অবস্থা। তবে আগে কেন বললে না, কেন বললে না—সব পাপ তুমি নেবে—তাহলে যে আমি ডুবে যেতাম পাপের গভীরে। ওগো এতই যখন তোমার কৃপা—তবে কেন হলে অত কৃপণ।

গিরিশ ঘোষের এ যেন এক উল্টো অবস্থা। ঠাকুর তাঁর পাপ নিয়েছেন শুনে কোন অনুশোচনা নেই, বরং ক্ষোভ আরো পাপ করতে না পারার জন্যে।

হবে না কেন? গিরিশ ঘোষ যে মনেপ্রাণে জানেন, ঠাকুর তার যুগাবতার। যুগের কলুষ নাশে, যুগকে পুণ্যময় করতেই তাঁর এই আবির্ভাব। তিনি তো পাপ গ্রহণ করবেন বলেই এসেছেন। তবে আমরা যারা পাপী—তারা করব না কেন পাপ—আরো পাপ। কেন পাবো না তাঁর করুণা—আরো করুণা।

অদ্ভুত যুক্তি গিরিশের। অদ্ভুত ভাব তাঁর। কেউ বোঝে না তাঁর এই ধারা। শুধু ঠাকুর—ঠাকুরই বর্ষণ করে চলে'ছন তাঁর ওপর করুণা স্নেহের মন্দাকিনীর প্রবাহ। বলেন, গিরিশের কথা আলাদা। গিরিশের আমার যোগও আছে, আবার ভোগও আছে।

ব্যাপারটা কেমন জান, ঠিক ওই লঙ্কার রাজা রাবণের মত। দেবকন্যাই বল, আর নাগকন্যাই বল—সবাইকে তার চাই। কিন্তু শুধু কন্যাতে তুষ্ট নয় সে, সেই সঙ্গে চায় সে রামচন্দ্রেরও চরণ। তাই তো তার সীতাহরণ।

এক ভক্ত সেদিন জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ তো মাতাল। থিয়েটার করে মেয়েছেলেকে নিয়ে। তবু আপনি ওর অত অত্যাচার সহ্য করেন কেন?

সে কী কথা গো, যদি ভেদাভেদই থাকবে তাহলে আর ব্রহ্মজ্ঞান কি? সবার মধ্যেই যখন তিনি আছেন তখন তুমিও যা, মাতালও তা। সতীলক্ষ্মীই বল, আর বেশ্যাই বল—সবই তো তিনি। সেই তাঁকে যদি প্রণামই না করতে পারলুম তাহলে আর করলুমটা কি?

তবু গিরিশবাবুর প্রতি আপনার স্নেহটা যেন একটু বেশি।

হবে না কেন, বয়ে যাওয়া ছেলেটির দিকেই মার নজর থাকে বেশি, তাকেই তিনি ভালবাসেন সবার চেয়ে।

এ তো সত্য। শাশ্বত। এরপর আর কি কথা হতে পারে? তাছাড়া ঠাকুরের কাছে তো কোন ভেদ নেই। ধনীরও তিনি, গরিবেরও তিনি, ভালর তিনি আবার মন্দেরও তিনি। তিনিই সব আবার তিনিই তাঁর।

গিরিশ ঘোষ এসেছেন বাগবাজার থেকে। শরীরে সারা রাজ্যের ক্লান্তি। তবু এসেই সোজা দোতলায়। কই ঠাকুর কোথায়?

কে? গিরিশ এসেছে? ওগো, আলোটা একটু ধর তো, একটু ভাল করে দেখি আমার গিরিশকে।

মাস্টার ছিলেন কাছেই। তিনিই তুলে ধরেন আলোটা। অসুস্থ শরীরে নিদারুণ যন্ত্রণার দাহ সহ্য করে উঠে বসেন ঠাকুব। গিরিশের দিকে একটু ঝুকে বলেন, কি ভাল আছ?

আর ভাল? ভাল থাকতে দিচ্ছেন কোথায়?

সে কী গো? আমি আবার কী করলাম? বেশ হাসি হাসি মুখে বলেন ঠাকুর।

কেন? একটু ভাল থাকতে পারেন না। অত দূর থেকে আসতে হয় রাজ্যের উদ্বেগ বুকে চেপে রেখে। সব সময়ই ভয়, কি জানি কী হয়?

সে তো ভালই গো, সব সময় মন রয়েছে এইখানে।

আর ভালয় কাজ নেই আমার, এখন তুমি ভাল হয়ে ওঠো দিকি। ব্যাজার মুখে বলেন গিরিশ।

তাঁর ভাব দেখে হেসেই বলেন ঠাকুর লাটুকে, ওরে শীগগির তামাক দে।

লাটু তামাক সেজে নিয়ে আসেন। এবার যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন ঠাকুর নিজেই। দূর থেকে ছেলে এলে যে উদ্বেগ দেখা দেয় বাবা মায়ের মনে ঠিক সেই উদ্বেগ তখন ঠাকুরের কথায়। তাই তো, অত দূর থেকে এসেছে। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই ওরে, ওকে খাবার দে। বরানগরের ফাগুর দোকান থেকে কচুরি নিয়ে আয় গরম গরম।

গিরিশবাবু তামাক খাচ্ছেন আর কথা বলে যাচ্ছেন। এমন সময় একটি ভক্ত এসে দু'গাছি মালা পরিয়ে দিলেন ঠাকুরের গলায়।

মালা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন ঠাকুর। তারপর একটি মালা খুলে নিলেন তিনি। তারপর পরিয়ে দিলেন তিনি সেটি গিরিশ ঘোষের গলায়।

এত লোক থাকতে গিরিশ ঘোষ! সবাই তাকিয়ে দেখেন ঠাকুর যেন ধ্যান-মগ্ন। গিরিশ ঘোষের তামাক টানা গেছে বন্ধ হয়ে। গিরিশও স্থির।

এ যেন এক পূজা। ঠাকুরই পূজা করছেন ভক্তকে। এতদিন যে দিয়ে এসেছে ও রাঙা চরণে আজ তারই গলায় দুলছে মালা।

দুলবে না কেন? ঠাকুর যে তখন দেখছেন গিরিশের মধ্যে ভৈরবকে। তাঁরি মধ্যে দিয়ে তাঁকে। একটু আগেই তিনি বলছিলেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপসীত—সব কিছুই উৎপন্ন হয়েছে সেই ব্রহ্ম থেকে আবার লীন হয়ে গেছে সেই ব্রহ্মেই। জীবন ও মৃত্যু তাতেই। তাঁকেই উপাসনা কর শান্তভাবে।

এতো তাঁর শুধুই উপদেশ বা কথা নয়। এ যে তাঁর চরম ও পরম উপলব্ধি। সেই উললব্ধির প্রকাশ এমনিভাবেই ঘটিয়েছেন তিনি বারে বারে—নানা ভাবে। ভক্ত যাকে পূজা, পূজ্যেরও সে পূজা—সে তো সেই এককেই। সেই একেরই আরাধনার এও তো আরেক সাধনা।

ঠাকুর কিন্তু মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করছেন, কই খাবার এল?

গিরিশের যে ক্ষিদে পেগেছে। এত দেরি কেন?

থামুন মশাই। আমার খিদে পায়নি। বিব্রত গিরিশ যেন জোরেই বলেন কথাগুলি।

ওগো তোমার খিদে পিপাসা পেয়েছে কি না সে যে আমিই জানি, আমাকে যে জানতে হয়।

এ কোন খিদে পিপাসার কথা বলছেন ঠাকুর। একি সামান্য খুন্নিবৃত্তির কথা, নাকি অন্য খিদে, অন্য পিপাসা?

ততক্ষণে এসে গেছে লুচি, কচুরি। বিখ্যাত সেই ফাগুর দোকান থেকেই। থালায় সাজিয়ে তুলে ধরা হয় তা গিরিশ ঘোষের সামনে।

কি গো, ভাল না, ফাগুর দোকানের খাবার খুব ভাল। লুচিও ভাল, কচুরিও ভাল। তবে তুমি কচুরিগুলো খাও—জান তো কচুরি হ'ল রজোগুণের।

ওগো গিরিশকে কি জল দেওয়া হয়েছে? বলেই অসুস্থ শরীরেও উঠে দাঁড়ান ঠাকুর। কোমর থেকে খসে যায় কাপড়। সম্পূর্ণ নিরাবরণ তিনি নিরাভরণে—তবু যেন শিশুর মত সহজ সরল। সেই অবস্থাতেই তিনি যান ঘরের এক কোণে। সেখানে কুঁজোতে রয়েছে জল। কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে তাই চাখেন একটু নিজের হাতে। না, তেমন ঠাণ্ডা হয়নি, তা না হোক, এতেই শান্ত হবে তুমি। শীতল হবে প্রাণ। নিজের হাতে গিরিশকে তুলে দেন

অভয়বারি—তৃষ্ণা—সে পার্থিব কিংবা পরমার্থিক—সব কিছুরই নিরসনের। সব কিছু দানের।

অকারণে অকাতরে কৃপা করেছেন তিনি গিরিশকে। তাই গিরিশ আজ ধরেছেন শক্ত হাতে। তোমাকে ভাল হতেই হবে।

তার আমি কি জানি?

না, জানতে হবে তোমাকেই।

ওরে ভাল হওয়া কি আমার হাতে?

বেশ, তবে কেমন করে ভাল করতে হয় তা আমার জানা আছে। আমিই ভাল করব তোমাকে।

এ তো আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল। ওরে ছাড়—ছাড়।

না, আজ তোমাকে ভাল করেই ছাড়ব।

বেশত, বেশত, এখন ছাড়। ওরে আবার তামাক আন গিরিশের জন্য। ঠাকুর বুঝি ছাড়া পাবার জন্য বলেন।

গিরিশ কিন্তু কেঁদেই আকুল। ওগো তুমি আমার এত আপনার, তবু প্রাণভরে সেবা করতে পারলুম না—এ দুঃখু আমি কোথায় রাখব?

তুমি তো ভগবান। ওগো ভগবান তুমি আমায় শুধু একটা বর দাও, আর একবছর—একবছর তুমি থাকবে। আমি প্রাণভরে সেবা করব তোমার। মুক্তি-ফুক্তি কিছু চাই না। শুধু সেবা—শুধু গুরু শুশ্রূষা করার একটা সুযোগ দাও আমাকে—

গিরিশের কান্নায় বিচলিত ঠাকুর বলেন, ওরে, এখানকার লোক সব ভাল নয়, কেউ আবার কিছু বলবে। এখানে ওসব বরফর চলে না।

গিরিশের এখন অন্য ভাব। দাপটের সঙ্গে গিরিশ বলে, আর কোন কথা শুনব না আমি। শুধু একটি বর, শুধু একটি বছর। ওই একটি বছর আমি তোমার সেবা করব আমার মনপ্রাণ ঢেলে।

গিরিশের রোক দেখে ঠাকুর সস্নেহে বলেন, এ তো আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল।

হ্যাঁ পাগলই। এ পাগল আজ তোমায় ছাড়বে না।

পাশ কাটাতেই ঠাকুর যেন বল্লেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। সে যখন তোর বাড়ি যাব সেই সময় হবে।

না, আমার বাড়ি নয়, সে কি একটা জায়গা নাকি? এই—এইখানে—যেখানে তুমি থাচ্ছ, শুচ্ছ—সেইখানে।

কি আর করেন ঠাকুর। যেন নাচার হয়েই বলেন, আচ্ছা তাই, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়—

ঈশ্বরের ইচ্ছা? যেন গর্জে ওঠেন গিরিশ। ঈশ্বরের আবার ইচ্ছা কি? আমার ঈশ্বর তো তুমিই। বল তোমার ইচ্ছা। বল, তোমার ইচ্ছা হ'লে আমি তোমার ওই অসুখ-টসুখ সব ভাল করে দিতে পারি।

কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে ঠাকুরের মুখে। তিনি বলেন, কলম ছেড়ে এখন বুঝি ডাক্তারি ধরেছিস? তা বেশ, বেশ।

ওসব তামাসার কথা নয়। সত্যিই আমার কাছে ওষুধ আছে। আমি ভাল করে দেব তোমাকে।

তুই?

হাঁ। আমি। মন্ত্র আছে আমার কাছে।

মন্ত্র?

হাঁ। মন্ত্র। একবার শুধু উচ্চারণ কর তুমি সে মন্ত্র। ব্যস, তাহলেই তোমার ব্যাধি মুক্তি।

তাই নাকি রে? কি মন্ত্র রে?

এ কি ঠাকুরের প্রশ্রয়, না কি কৌতুক? না কি এও তাঁর আরেক লীলার অবতারণা?

গিরিশের কিন্তু হুঁশ নেই কোনদিকে। তিনি শুধু বলেন, একবার, শুধু একবার তুমি বল, আমার এ অসুখ ভাল হয়ে যাক। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তোমার এসব আধিব্যাধি কোথায় পালাবে তার পথ খুঁজে পাবে না।

ঠাকুর কিন্তু বলেন, না, না, ওসব আমি পারব না।

পারবে না মানে, পারতেই হবে তোমাকে। বেশ, না পার তো, আমিই ঝেড়ে দেব। গিরিশ এবার দুপায়ে খাড়া। কালী—কালী—মহাকালী। যা—ভাল হয়ে যা, আমার ঠাকুরের সব রোগ ভাল হয়ে যা।

ঠাকুরের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বিড়বিড় করে বলেন গিরিশ আর ফুঁ দেন। যদি ও পায়ে আমার বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকে তবে ভাল হয়ে যা। বল, ভাল হয়ে গেছ। ভাল হয়ে গেছ তুমি।

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল, না, না, ওসব আমি বলতে পারব না।

কাকে বলতে পারবে না ?

মা-কে।

মা আবার কে ? তুমিই মা, তুমিই কালী। তুমিই ত্রিগুণাত্মিকা, তুমিই সৃষ্টি, তুমিই মেধা, তুমিই শান্তি, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই পরমেশ্বরী। বল তুমি, বল আমার যদি ও পায়ে বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকে, বল আছে কিনা—যদি থাকে তবে বল তুমি ভাল হয়ে গেছ।

ছিঃ অমন কথা বলতে নেই।

বলতে নেই মানে ?

ওরে আমি হচ্ছি সেই মহান প্রভুর দাস, আমি চলি তাঁর ইঙ্গিতে, তাঁর কথায়। আমি তাঁর হাতের যন্ত্র—যখন যেমন যে সুরে বাজান তিনি তেমনি বাজি। ওরে আমার কিছু নেই, আমি কিছু নয়।

তুমি কে, কে নয়—সে আমি জানি। কাজ কি তোমার নতুন করে সেসব কথায়। আজ শুধু তুমি বল—ছোট্ট একটি কথা, আমি ভাল হয়ে যাব।

আচ্ছা নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। আচ্ছা যা, যা হয়েছে তা যাবে।

জয় মা—জয় মা—লাফিয়ে ওঠে গিরিশ।

ওরে পাগল এখন তুই যা। তোকে ডাকছে।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে গিরিশ এসেছেন ওপরে। হাঁক দিচ্ছে গাড়োয়ান। তেড়ে যান গিরিশ—আর ডাকার সময় পেল না।

তাঁর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন ঠাকুর—পাগল—পাগল।

তিনি কৃপাময়।

কৃপাতেই তাঁর আনন্দ। কৃপাতেই শান্তি। কৃপাতেই সব।

কোন ভেদ রাখব না। কৃপার কাছে কি কোন ভেদ আছে ! যেমন ভেদ নেই জলের। ভাল হোক, মন্দ হোক, ধনী হোক, নির্ধন হোক, সাধু হোক, চোর হোক, মানুষ হোক, পশু হোক—যে যাই হোক, দাঁড়াও ওই

তয়োনিধি কূলে—আঁজলা ভরে তুলে নাও—পান কর—তৃপ্ত হও। শুধু নিয়ে যাও—দিতে কার্পণ্য নেই এতটুকু।

এই শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে কে আছ মানব তুমি শুধু নিয়ে যাও।

তাই বুঝি যে পাগলী ঠাকুরের এত ভয়, তাকে কৃপা করতেও এতটুকু দ্বিধা নেই।

পাগলী প্রথম এসেছিল বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে। গলাটি ভারী মিষ্টি। গান করত মায়ের। শুনে জল আসত চোখে।

একদিন পাগলী ধবল ঠাকুরকে। নাকি ঠাকুরই পাগলীকে। হ্যাঁ গো তোমার কি ভাব?

আমার মধুর ভাব। সেই ভাবেতেই আমি পাই আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ।

পাগলীর কথা শুনে চমকে ওঠেন ঠাকুর। বলেন, ওরে বাবা আমার যে সন্তান ভাব। সবার মধ্যেই দেখি মাকে। সব প্রকৃতিই যে মা।

মধুরভাবের সাধিকা এই পাগলীকে ঠাকুরের অত ভয়। ভয় বলে কি তাকে দূরে রাখবেন? তাও কখনও পারেন? কাশীপুরে তাই প্রায় নিত্যই পাগলীর আনাগোনা। সময় নেই, অসময় নেই, হুট করে আসবে আর হুড়দাড় করে চলে যাবে দোতালায়। ঠাকুরের ঘরটিতে বসে গান শোনাবে তাঁকে। ভাবে বিভোর ঠাকুর সে গান শুনে হন সমাধিস্থ। পাগলীর কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই।

এবার যদি পাগলী আসে তবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব এই ওপর থেকে।

শশীর এই উত্তেজনা দেখে ঠাকুর বলে উঠেন, না, না। আসবে, চলে যাবে।

তাই যদি হবে, তবে তুমি বলেছিলে কেন? সত্যিই তো। ঠাকুর সেদিন বলে উঠেছিলেন, ওরে বের করে দে, পাগলীকে বের করে দে বাগান থেকে।

নিরঞ্জন লাঠি নিয়ে তাড়া দেয়। কালীপ্রসাদ তো একদিন হিড়হিড় করে থানাতেই রেখে এল। তা তাতে হবে কি? ছাড়া পেতেই আবার আসে।

না, ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। নিরঞ্জন একটা ফাঁকা ঘরে আটকে রাখল পাগলীকে।

পাগলীর সঙ্গে কি এরাও পাগল হ'ল নাকি? রাখাল তো সেদিন বলেই ফেলল, আচ্ছা একটা পাগল, তার ওপর তোমাদের এত রাগ কেন?

সে কথা শুনে গর্জে উঠল নিরঞ্জন। তোর ঘরে মাগ আছে কিনা তাই মন কেমন করে? কিন্তু আমরা, আমরা দরকারে ওকে বলিদান দিতে পারি।

ভারি বাহাদুরি। বলি ঠাকুর কি শুধু তোর আমার একার? আর কারো নয়? উনি কি শুধুই মদ্‌গুরু, উনি কি জগদ্‌গুরু নন? শুধু কি তোকে আমাকে তরাতেই এসেছেন উনি, আর কাউকে তরাতে নয়? উনি কি শুধুই এই ক'টা লোকের? আর কারো নয়? ওরে উনি যে সবার। তোর আমার—ঘরের বাইরের সবার—উনি সুস্থেরও—পাগলেরও।

তাই বলে অসুখের সময় বিরক্ত করবে? উপদ্রব করবে? শশীর কথার সুরে যেন একটু অসহায়তা। দাপট নেই আর আগের মত। উপদ্রব কি আমরাই কম করেছি, করিনি? উপদ্রব করেনি গিরিশ ঘোষ? তর্কের পর তর্ক জুড়ে নরেন, ডাঃ সরকার উপদ্রব করেনি? ওঁর কথামত চলতে না পেরে উপদ্রব করিনি আমরা? তবু—তবু আমরাই পাব শুধু ওঁর কৃপা, আর কেউ নয়—এ কেমন কথা?

আহা রাখাল বড় ভাল বলেছে। বড় ভাল বলেছে। খাঁটি কথা বলছে—তার আবার রাখঢাক কি? ঠাকুর তাই যেন বললেন, রাখাল কিছু খাবি?

সে কথা শুনে শান্তস্বরেই বলে রাখাল, খাবো'খন।

ওদিকে পাগলী এসে শুধু প্রণাম করেই চলে গেল। কিন্তু ও তো একদিন। তারপর আবার যে কে সেই। সেই নাচ সেই গান। ঠাকুরের সেই ভাবসমাধি।

আর সহ্য হয় না নিরঞ্জনের। কাঁচি এনে চুলগুলো কেটে দিল পাগলীর। পাগলী সেই যে গেল আর এল না।

নিরঞ্জন এই যে কাণ্ডটা করল এটা কিন্তু অন্য ভাবে নয়, এ শুধুই গুরু সেবার জন্য।

আসলে ঠাকুরের এই যে অসুখ, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এই যে অবস্থান—এরও পেছনে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য। মাস্টারকে বলছিলেন ঠাকুর, জান তো, লোক বাছা চলছে। এই অসুখ হওয়াতে বোঝা যাচ্ছে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ। যারা সংসার ছেড়ে সবকিছু ত্যাগ করে এখানে পড়ে আছে তারা অন্তরঙ্গ, আর যারা দূর থেকে, কি মশাই কেমন আছেন বলে কর্তব্য সারছে তারা বহিরঙ্গের। এবারের রঙ্গ জমবে এই অন্তরঙ্গদের দিয়েই। তারাই তুলে ধরবে ধ্বজা।

ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসেন বুড়ো গোপাল।

হাঁপাতে থাকেন তিনি অত দ্রুত আসায়।

সেদিকে তাকিয়ে শান্তভাবেই বলেন ঠাকুর, কিরে কি হয়েছে ?

নরেন নেই।

নেই মানে, নেই কিরে ?

মরে গেছে।

যাক। বড় সমাধি সমাধি করছিল, এখন ঘুরে দেখুক সে দেশ। বুঝুক কেমন দেশ সেটা।

অনেকদিন থেকেই নরেন ধরেছিলেন ঠাকুরকে, কি করছ, এতদিন হয়ে গেল আমার এতটুকু সমাধি-টমাধি কিছুই হ'ল না। সবাইয়ের হ'ল, আমায় কিছু দিন। সবাই-এর হ'ল আমার কিছু হবে না ?

কেনরে, এই তো বেশ আছিস।

না, ওসব আমি শুনবো না।

তুই বাড়ির একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে। তুই কি চাস ?

'আমার ইচ্ছা অমনি তিন চারদিন সমাধিস্থ হয়ে থাকবো। কখনও এক একবার খেতে উঠবো।'

কথাটা শুনেই ঠাকুর বললেন—যেন একটু ধমকের সুরেই বললেন, 'তুই তো বড় হীন বুদ্ধি। এ অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস, 'যো কুচ হায় সো তুহি হায়।' তারপর একটু থেমে আবার বললেন, যা বাড়ির একটা ব্যবস্থা করে আয়, হবে।

নরেন কথাটা শুনে বাড়ি এলেন। সবাই ধমকাতে লাগলেন তাঁকে—দু'দিন বাদে পরীক্ষা, আর কি শুধু হোহো করে বেড়াচ্ছিস। মা ভুবনেশ্বরী কিন্তু কিছু বললেন না, শুধু ছেলেকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত তিনি। হরিণের মাংস ছিল, তাই নিয়ে এলেন বাটি করে।

নরেন মাংস খেলেন কিন্তু তেমন ভাল লাগল না। নরেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন দিদিমার বাড়ি। পড়ার ঘরে গিয়ে বই খুলে বসতেই কেমন যেন

ভয় চেপে বসল বুকে। একটা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। শেষ পর্যন্ত কান্না আর বাঁধ মানল না। আকুলভাবে কাঁদলেন নরেন। তারপর বইটই ফেলে রাস্তা দিয়ে দে ছুট। কোথায় রইল জুতো, কোথায় চাদর। নরেন দৌড়চ্ছেন কাশীপুরের রাস্তা ধরে। খড়ের গাদার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে খড়টড় গায়ে মাথায় মেখে একাকার।

কিরে কি হ'ল? ঠাকুর হেসেই জিজ্ঞাসা করেন।

সংসার তো নয়, পাতকুয়ো।

আর?

আত্মীয় তো নয়, সব কালসাপ।

বেশ বলেছিস। এমনি তীব্র বৈরাগ্য চাই। সেই গল্পটা জানিস তো, একজন গিয়ে তার গুরুকে বলল, আচ্ছা ঈশ্বরকে কি করে পাওয়া যায়।

গুরু বললেন, আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে। দেখিয়ে দি তোকে কেমন করে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

মনের আনন্দে শিষ্য চলেছে। গুরু একটা নদীর কাছে এসে বেশ করে শিষ্যকে জলে চুবিয়ে দিল। খানিকক্ষণ ওই করে শিষ্যকে ছেড়ে দিয়ে গুরু বলে, কি রকম লাগছিল?

আর কিরকম, প্রাণ একেবারে যায় যায় হচ্ছিল।

এই—এই রকম যখন প্রাণটা যায় যায় করবে তখনই জানবে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরি নেই। যেমন অরুণ উদয় হলে—পুব দিক লাল হলে বোঝা যায় সূর্য উঠবে—সেইরকম আর কি।

নরেনের কিন্তু সমাধিমগ্ন হবার বাসনা যায় না মন থেকে। সব ছেড়ে যেজন্য এলাম তাই যদি না হ'ল তাহলে লাভ কি সব ছাড়ার? এমনি একটা ভাব নরেনের।

অবশেষে এই কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই এল সেই ভাব। ঠাকুরই সেদিন বললেন, যা নিচে গিয়ে বস ধ্যানে। ধ্যানে বসবার আগে নিজের হাতে মাটির কুণ্ডল গড়িয়ে ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন পঞ্চবটীতে ধ্যানের জন্য। বলেছিলেন, এই কুণ্ডল পরে বুদ্ধদেব হয়েছিলেন সিদ্ধকাম। আশীর্বাদ করি তুমিও হবে। তারপর আজ আবার পাঠালেন। মনের আনন্দে নরেন আর বুড়ো গোপাল বসেন পাশাপাশি। চোখ বুজে ধ্যান করছেন নরেন। বুড়ো গোপাল কিন্তু মাঝে মাঝেই চোখ খুলে দেখছেন। একনিষ্ঠ হতে পারছেন না

তিনি। দেখছেন, দেখছেন। কিন্তু কই, নরেনের চোখের পাতা তো একবারের জন্যও নড়ে না। একবারও তাকায় না নরেন।

এবার ধ্যানের আসন ছেড়েই উঠে পড়েন বুড়ো গোপাল। দেখেন, কোন সাড় নেই নরেনের। নিশ্চল, নিস্পন্দ। ডাক দেন তিনি। কিন্তু কোন সাড়া নেই।

ভয় পেয়ে যান বুড়ো গোপাল। ছুটে যান ওপরে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর কিন্তু কোন গুরুত্বই দেন না তাঁর কথায় বরং বলেন, মরুক, দেখুক সেই সমাধির রাজ্য।

একটু বাদে আস্তে আস্তে নরেন আবার ফিরে আসেন বাহ্যভূমিতে। এক অপার আনন্দে তাঁর শরীর যেন টলমল, মাতালের মত ছন্দহীন ছন্দে তিনি আসেন ওপরে। তাঁকে দেখে ঠাকুর বলেন, কিরে ঘুরে এলি, দেখলি সমাধির রাজ্য?

নরেনের মুখে প্রশান্তি। তাই কথা নয়, মাথা নেড়ে দেন সায়। ঠাকুর কিন্তু বলেন, খুব তো জ্বালিয়েছিলি সমাধি সমাধি করে, পেলি তো এখন সমাধির আনন্দ।

নরেন হাসেন। ঠাকুর কিন্তু বলেন, তবে যাই বল, ঘর তোকে দেখালাম বটে, কিন্তু দরজায় চাবি এঁটে বন্ধ করে দিলাম।

সে কথায় চমকে ওঠেন নরেন, বন্ধ করে দিলেন? কিন্তু তার চাবি?

তার চাবি আমার কাছে থাকল। সে ঘরে তোর হামেসা যাওয়া চলবে না। তোর যে অনেক কাজ।

কাজ? কিসের কাজ? কার কাজ?

নরেনের সে ঝঙ্কার শুনে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন ঠাকুর, আমার কাজ। সে কাজ যখন ফুরোবে তখন আমিই আবার চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ দোর খুলে দেব।

কিন্তু কাজটা কি শুনি?

এবার কিন্তু উত্তর দিলেন না ঠাকুর। তুলে নিলেন কাগজ পেনসিল। তারপর যেন অতি গোপন কথাটি জানাচ্ছেন, এমনিভাবে লিখলেন, লোকসিক্ষে।

দুষ্টু তেজী ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে নরেন বলেন, বয়ে গেছে। পারব না। কিছুতেই পারব না আমি।

তুই পারবি না তোর ঘাড় পারবে। ওরে ঘাড়ে করে করিয়ে নেবে সেই— যার কাজ সেই করাবে। ভুলে যা তুই কে? কি তোর পরিচয়। শুধু মনে রাখ তুই ঘর, তিনি ঘরনী। তুই যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তুই বিদ্যা, তিনি বেত্তা। তুই কর্ম,

তিনি কর্মী। তিনি করাচ্ছেন তাই তুই করছিস। না হলে তুই কে—তোর করার ক্ষমতা কতটুকু ?

শুধু কথা নয়, একবারে পাকা ফরমান—একবারে যেন পাঞ্জা দিয়ে দিলেন ঠাকুর রাজা-বাদশার মত তাঁর নরেনকে। লিখলেন, 'জয় রাধে প্রেমময়ী। নরেন সিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে, জয় রাধে।'

শেষ তখনও মেলাননি অশেষে। পশ্চিম দিগন্তে তখনও শেষ সূর্যের রক্তিমাভা। তারই মধ্যে এই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে বসেই ঠাকুর কাগজ পেনসিল দিয়ে আঁকলেন একটি ছবি। দিলেন পাকা ফরমান নরেন্দ্রনাথকে।

ক্যান্সারের তীব্র দহনে তখন জ্বলছেন ঠাকুর। কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসছে বারেবারেই—তা বলে বীণা তো তাঁর সঙ্গীতহারা নয়। বরং বাজছে তখন ঝালায়– রাগের পরিপূর্ণ রূপটি প্রতিভাসিত করতে। তাই তাঁর সেই ছবি হয়ে উঠল অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়।

কণ্ঠে তাঁর ক্যান্সার। কিন্তু সে কি শুধু তাঁরই কণ্ঠে ? নাকি এ ক্যান্সার সমগ্র মানবজাতির ? সমগ্র যুগের যন্ত্রণার প্রতীক তাঁর ওই ক্যান্সার ?

তবে কি যন্ত্রণাই সব। ওখানেই ইতি। নেই কোন আশা, কোন ভরসা ? নিকষকালো অন্ধকারই শুধু ভবিষ্যৎ। শুধু কান্না—শুধু হাহাকারই শুধু সম্বল ? না—তা নয়। সবশেষে যে আনন্দ। 'আনন্দো ব্রজতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রাস্ত্যভি-সংবিশন্তীতি।'—আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই জন্মায় জীব—আনন্দেই পরিবর্ধিত হয় সে—পরিশেষে আনন্দেই তার প্রস্থান। তাই সেই আনন্দের রূপটিকে ঠাকুর ফুটিয়ে তুললেন বিচিত্ররূপিণী কলাপের মধ্য দিয়ে।

১৮৮৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শনিবারের সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, ঠাকুর চেয়ে নিলেন একটুকরো কাগজ আর পেনসিল।

সেদিন সকাল থেকেই বেড়েছে যন্ত্রণা, বেড়েছে রোগের প্রকোপ, মাঝে মাঝেই কণ্ঠ হচ্ছে রুদ্ধ। পুঁজ রক্ত উঠে আসছে গলা দিয়ে। গাঁদা পাতার পুলটিস দিয়েও লাঘব হচ্ছে না যন্ত্রণা।

সেই ভয়ানক যন্ত্রণার মুহূর্তে ঠাকুর আঁকতে বসলেন ছবি। একটি মানুষের মুখ, গলায় তার ক্ষত চিহ্ন—পেছনে পেখম লুটিয়ে আসছে ময়ূর আর তারই

ওপরে ঠিক যে বানানে যে কথা তিনি লিখেছিলেন তা হ'ল 'জয় রাধে প্রেমেহি নরেন সিক্ষে দিবে যখন ঘরে বহিরে হাঁক দিবে জয় রাধে'।

আপন যন্ত্রণা অথবা যুগ যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র পেখমধারী ময়ূরের মধ্য দিয়ে আশার সংকেত আর নরেনকে লোকশিক্ষা দেবার স্থায়ী চাপরাশ।

আশ্চর্য সেই দহনের মধ্যেও প্রেম। তাই ব্রহ্মময়ী মা নন, প্রেমময়ী রাধা। আগেও রাধা পরেও রাধা। জাতকুলমান সব ভুলে, সব ত্যাগ করে রাধার মত প্রেমের মধ্য দিয়েই দিতে হবে শিক্ষা—করতে হবে সেবা—সেই অনুজ্ঞারই প্রকাশ ওই ফরমান।

সেই পরব্রহ্মে ফিরে যাবার, লীন হবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের রূপ-রেখাটি এঁকে দিলেন তিনি নিজে। বলে গেলেন সে সংঘের মূলমন্ত্র হবে প্রেম। ত্যাগ। সেবা। শিক্ষা। আরও বললেন নরেন্দ্রনাথকে, দেখ বাবা এখানে যেন কেউ কারণ পান না করে। ধর্মের নাম করে মদ খাওয়া একদম ভাল নয়। আমি দেখেছি, যেখানে ওরকম হয় সেখানে ভাল হয়নি। সেই মন্ত্র আজও স্ফুরিত মঠ ও মিশনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে। আজ সবার কাছে মান্য সেই নিষেধ।

ঠাকুরের যাঁরা ত্যাগী সন্ন্যাস, তাঁরা প্রায় সবাই এসে জুটেছেন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। বাড়িঘর ছেড়ে ঠাঁই নিয়েছেন সেখানে। সেবায় যত্নে তাঁরা তাঁদের আত্মারামের করতে চান আরাম। ওই সঙ্গে ভরিয়ে নিতে চান নিজেদের সঞ্চয়ের ঝুলি। আর ঠাকুর তো সব কিছু তাঁর দিতেই বসে আছেন। পাত্র পেলেই হ'ল ভরিয়ে দিচ্ছেন দু'হাত ভরে।

এইসব তরুণ ভক্ত সেবানিষ্ঠা, অধ্যাত্মিক জগতে বিচরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব চাপল্যে মাঝে মাঝেই ওঠেন মেতে। কিন্তু তাঁদের সবকিছুর ভার নিয়েছেন যে ঠাকুরটি তাঁর সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে কুটোটি নাড়ার উপায় নেই।

সেদিন বাগানের পুকুরে মাছ ধরতে বসেছেন নরেন, নিরঞ্জন আর কালী। ওঁদের মধ্যে কালী যেন ওস্তাদ মেছুড়ে। নরেন নিরঞ্জন একটা মাছ ধরেন তো কালী ধরেন চারপাঁচটি। মনের আনন্দে মাছ ধরছেন তাঁরা, খেয়াল নেই কোন-

দিকে। এমন সময় ডাক এল ঠাকুরের। নরেন, নিরঞ্জন, কালী তিনজনকেই ডেকে পাঠালেন তিনি।

কালীকেই বললেন, মাছ ধরছিলি নাকি তুই? খুব মাছ ধরিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছিপ দিয়ে মাছ ধরা বড় পাপ।

ঠাকুরের কথাটা শুনেই নরেন যেন ফুঁসে উঠলেন, কেন জীবহত্যা বলে?

হ্যাঁ, জীবহত্যা বলে।

সে কি? নরেন শানিয়ে তোলেন তাঁর যুক্তির তলোয়ার। তবে যে বলে, নায়ং হন্তি ন হন্যতে। আত্মা কাউকে মারতে পারে না, নিজেও মরে না, তাহলে পাপ কোথায়?

পাপ বিশ্বাসঘাতকতায়। খাবারের লোভ দেখিয়ে বঁড়শি লুকিয়ে রাখা আর অতিথিবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে এনে তার খাবারে গোপনে বিষ দেওয়া একই পাপ। আত্মা মরে না, অন্যকেও মারে না—একথা সত্য। কিন্তু এ জ্ঞান যার হয়েছে সে তো আত্মস্বরূপ হয়েছে। তার আর অপরকে হত্যা করবার প্রবৃত্তি হবে কেন? যতক্ষণ হত্যাপ্রবৃত্তি আছে, ততক্ষণ আত্মস্বরূপ হয়নি—আত্মজ্ঞানও হয়নি। জেনে রাখ, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে পা পড়ে না আর বেতালে।

আবার আরেকদিন—লাটু, রাখাল, নরেন, নিরঞ্জন ঠিক করলেন, বাগানের মধ্যে খেজুর গাছ আছে ভোররাতে চুরি করবেন সে গাছ থেকে রস। প্রাণভরে খাবেন গাছের টাটকা খাঁটি রস।

কিন্তু সে গাছের তলায় যে রয়েছে একটা কালসাপ সে কথা তো তাঁরা জানেন না। তাঁরা না জানলেও, যিনি জানার তিনি ঠিকই জানেন, ব্যবস্থাও করেন তিনি।

আর ছেলেরা—সব কিছু সঁপে দিয়ে হয়েছেন নির্ভয়। নিজেদের জন্য ভাবনার তাঁদের সময় নেই এতটুকু। তাঁদের নেই বলেই সময় করে নিতে হয় আরেকজনকে। রোগজীর্ণ দেহেও ছুটতে হয়।

সে রাতে হঠাৎ-ই উঠলেন ঠাকুর। দ্রুত গতিতে চলে গেলেন নিচে আবার একটু বাদেই ফিরে এলেন। তাঁর সেই যাওয়া আসা, তাঁর সেই দ্রুত গতি দেখলেন শুধু একজন। তিনি মা সারদামণি। অবাক বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন তিনি সব—কিন্তু বুঝলেন না, কেন ওই যাওয়া, রোগে খিন্ন দুর্বল শরীরে কোথা থেকে পেলেন অত দ্রুত যাওয়ার বল।

পরদিন পথ্যের পর জিজ্ঞেস করলেন মা। কাল রাতে বিছানা ছেড়ে ছুটেছিলে তুমি কোথায় ?

সে কথায় ঠাকুর বলেন, তুমি দেখেছ বুঝি ? কাউকে বলো না। ছেলেরা চুরি করে রস খাবার তাল করেছিল।

তারপর ?

ঠাকুর শোনালেন তারপরের কথা। বললেন, গাছের তলায় যে সাপ রয়েছে তাতো ছেলেরা জানে না, তাই বাধ্য হয়ে ঘুরপথে ছুটতে হ'ল আমাকেই। তাড়িয়ে দিয়ে আসতে হ'ল সে সাপ।

ছেলেরা তাহলে ফুর্তি করে রস খেয়েছে তো ?

খাবে কি করে ? গাছ খুঁজে পেলে তবে তো খাবে। সে রাতে নরেন, নিরঞ্জন, রাখাল, লাটু হাজার ঘুরেও তাঁদের অত চেনা জানা বাগানে খুঁজে পেলেন না সেই খেজুর গাছ। সারারাত তাঁরা শুধু ঘুরলেন। বুঝলেন এ সবই তাঁদের সেই অঘটনপটু ঠাকুরটির কাজ।

গাছ পেলেন না কেন তাঁরা ? পেলেন না, রসনার পরিতৃপ্তির জন্য লোভের বশবর্তী হয়ে এই যে চুরি তাঁরা করতে যাচ্ছিলেন তা করলে তাঁদের হতে হ'ত পতিত। লোভ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে তাঁদের সাধনায় আসত ছেদ। তাই তো ঠাকুর তাঁদের, প্রভু তাঁদের এমনি ভাবেই করলেন রক্ষা।

কিন্তু ঠাকুরের ভাবনা কি শুধুই তাঁর ভক্ত সন্তানদের জন্য ? অন্য কারো জন্য নয় ? তাও কি হতে পারে ? তিনি যে ভক্তের, অভক্তের, তিনি মানুষের, অমানুষেরও। তিনি জীবের, সর্ব প্রাণীর—কীটেরও।

তাই ভাবনায় পড়লেন একটা বিড়াল আর তার ছানাগুলোকে নিয়ে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কোথা থেকে হাজির হয়েছে যেন এগুলো। ঠাকুর বিড়াল-গুলোকে রাখেন যত্ন করেই। কিন্তু ভাবনা, এখানে তো দুধ মাছ নেই, এগুলো বাঁচবে তো ?

সেদিন এসেছেন নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী। তাঁকে ডেকে নিয়ে ঠাকুর বলেন, হ্যাঁ গো, তোমাকে একটা কথা বলবো।

ঠাকুরের জিজ্ঞাসায় যেন মরমে মরে যান নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তার জন্য এত সঙ্কোচ—এ দ্বিধা। লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে নবগোপালের স্ত্রী বলেন, বলুন।

মন্দাকিনী বইছে ওর অন্তরে। ও কখনো অপবিত্র হতে পারে? ওযে সদা আনন্দ। আনন্দেরই তার পাপক্ষয়—আনন্দেই মুক্তি। আনন্দই যে ব্রহ্ম।

ঠাকুর বলেছেন, তারপর আর কোন কথা নয়, নয় কোন সংশয়।

কালের চাকা ঘুরছে।

ঘুরছে দিন। ঘুরছে রাত্রি।

ঘুরছে জীবন। ঘুরছে মৃত্যু। ঘুরছ তুমি, ঘুরছি আমি। স্থির শুধু সেই সত্য—সেই ব্রহ্ম। স্থির শুধু তিনি। সর্বভূতে তিনি—সর্বচরাচরে তিনি—তিনিই আদি—তিনিই অনন্ত—তিনিই অক্ষয়—তিনিই অদ্বয়। তিনিই ঈশ্বর।

ঈশ্বর নাবালকের অছি।

ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চায় তাই পায়।

ভক্তের নৈবেদ্য—ভক্তের নিমন্ত্রণ—ভক্তসঙ্গে বিহার তাঁর প্রিয়।

তাই তো ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তিনি। ভক্তের আহ্বানে তাঁর এই মর্তবিহার—ভক্তের আশা মেটাতেই এই নরবপু ধারণ—ভক্তকে কৃপা করতেই নানারূপে তাঁর এই প্রকাশ।

এমনি এক মহামহিময় প্রকাশের দিন ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি। শতাব্দীর কল্পতরু ওইদিন দেখা দিলেন অভয়দাতারূপে। শুধু শতাব্দীর গণ্ডিতে তিনি বদ্ধ নন, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে তাঁর কৃপা বিতরণ। সে কৃপার ধারা অব্যাহত—অফুরন্ত। সদা প্রবহমান।

কালের বুকে চিহ্নিত সেই শুভক্ষণ ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারির অপরাহ্ণ।

মর্ত্যমানবের উদ্ধারে নরকায়া পরিগ্রহ করেছেন যে ঠাকুর তিনিই কৃপা-বিতরণে হলেন অকাতর—অনায়াস।

সময় তখন বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে। অসুস্থ ঠাকুর হঠাৎ-ই সুস্থ। অতি সুস্থ। শুরু হ'ল হাঁক ডাক, ওরে কোথায় আমার কাপড়, আমার পিরান, আমার টুপি। আজ সাজব। আজ আমি নববেশে প্রকাশিত হব। আজ যে আমার নব ভাবপ্রকাশের সময় এসেছে।

ঠাকুর সাজলেন। লালপাড়ের কাপড়। গায়ে পিরান, লালপেড়ে চাদর। কানঢাকা টুপি দিলেন মাথায়। পায়ে মোজা, চামড়ার চটি।

যেন মোহন বেশ। নিজের রূপটি নিজেই যেন দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। কিংবা যাঁরা এতক্ষণ সাজালেন তাঁকে তাঁদেরই সে রূপ দেখাতে তাঁর এই লীলাভিনয়।

এবার আমি নিচে যাব। বাগানে বেড়াব।

কিন্তু আপনার অসুস্থতা? দুর্বলতা?

না—নেই, কিছু নেই। আজ আমি অবারিত। আমি সদাব্রত। আমি আজ উদার—উন্মুক্ত।

ঠাকুর নামছেন ওপর থেকে। সঙ্গে লাটু। ওপর থেকে নিচে নামলেন ঠাকুর। নামলেন স্বাভাবিকতার পথে—সাধারণ যাঁরা—যাঁরা গৃহে থেকেই চান তাঁকে তাঁদের কাছে।

নিচের ঘরে ছিলেন তখন কিছু গৃহী ভক্ত। কিছু ভক্ত ছিলেন বাগানে। নিচে ঠাকুরকে দেখে উল্লসিত তাঁরা সঙ্গ নিলেন তাঁর। তাই দেখে লাটু ফিরে গেলেন ওপরে।

লাটু। বিহার থেকে একদিন এসেছিলেন 'নোকর' হয়ে। কিন্তু ঠাকুরের স্পর্শে, করুণায় হলেন সাধক। অসুখের সেই প্রথম পর্বে নিজের অশক্ত দেহটাকে নিয়ে যখন ঠাকুর-চিন্তিত, তখন এই লাটুই এগিয়ে এসে বলেছিলেন, 'যে আজ্ঞা মশায়, হামি তো আপনকার মেস্তর হাজির আছি।' ঠাকুরের সেই 'মেস্তর' এই ফাঁকে চলে গেলেন ওপরে—সবকিছু পরিষ্কার করার জন্য।

ওদিকে ঠাকুরকে দেখছেন গৃহী ভক্তের দল। দেখছেন দেদীপ্যমান এক অগ্নিশিখাকে। দেখছেন অকলঙ্ক চন্দ্রকে। দেখছেন অতলান্ত অসীম মহাসমুদ্রকে—দেখছেন সুবিশাল এক শেষাদ্রিকে। দেখছেন আশ্চর্য শীতল পাবককে।

কে উনি?

মৃত্যুর মুখেও অমৃত।

অন্ধকারে আলোক।

হতাশায় আশা।

যন্ত্রণার মুহূর্তেও হাস্যময়।

ওই বিরাটকে—ওই বিশালকে দর্শন করতে গিয়ে বারেবারে মন হয় সন্ত্রস্ত—সচকিত। হয় সঙ্কুচিত, আবার উন্মুক্ত।

তোমাকে বোঝার, তোমাকে জানার, তোমাকে ধারণ করার শক্তি দাও। আমাদের নয়ন দাও তোমাকে দেখার।

স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন ঠাকুর। নিচের হলঘরের পশ্চিমদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঠাকুর এগিয়ে চলে বাগানের দক্ষিণদিকের ফটকের দিকে।

প্রায় মাঝামাঝি এসে ঠাকুর দেখেন পশ্চিমে গাছের তলায় বসে আছেন গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েকজন। তাঁকে দেখেই তাঁরা এলেন এগিয়ে। হলেন অবনত।

আর অকস্মাৎ স্ফুরিত হল শ্রীরামকৃষ্ণ অধর থেকে ক'টি কথা—গিরিশ, তুমি যে সবাইকে বলে বেড়াও আমি নাকি অবতার—আমি বিরাট—এইরকম আরো কত কি কথা। কিন্তু তুমি আমার কি দেখেছ—কি বুঝেছ ?

প্রশ্ন তো নয়, যেন আত্মপ্রকাশের—দুর্জয় ঘোষণার ধ্বনি। সে ধ্বনির অনুরণনে স্তব্ধ সবাই। চরণে অবনত গিরিশ কিন্তু এতটুকু বিচলিত নন। কোন চিন্তা নয়, কোন ভাবনা নয়। কোন কৈফিয়তের সুর নয়। সুস্পষ্ট আত্ম-নিবেদন।

গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন গিরিশ, ব্যাস বাল্মীকি পায়নি যাঁর অন্ত, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি কি বলতে পারি ?

গিরিশের সে কথায় ভাবগম্ভীর ঠাকুর। উচ্চভূমে হল তাঁর অবস্থান। তিনি হলেন সমাধিস্থ। দেবভাবে প্রদীপ্ত ঠাকুরের বদনমণ্ডল দেখে ভক্তিতে, আবেগে, উল্লাসে গিরিশ বারবার বলে উঠলেন,—'জয় রামকৃষ্ণের জয়, জয় রামকৃষ্ণের জয়'। সে ধ্বনিতে সুর মেলালেন ভক্তের দল।

মা জাগ, মা জাগ বলে হাত তুললেন ঠাকুর। অর্ধ-বাহ্যদশায় মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল বাণী—তোমাদের আর কি বলব ? আশীর্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হোক।

চারিদিক যেন চৈতন্যময় হয়ে উঠল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চৈতন্যময় হবার আকাঙ্ক্ষায় সবাই তখন আকুল। তাঁকে প্রণাম করেন, পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন আর আগের সব প্রতিজ্ঞা ভুলে লুটিয়ে পড়ে বুকে টেনে নেন তাঁর পা।

তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্পর্শ করবেন না তাঁকে।. কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁরা ঠাকুরের মধ্যে দেখতে লাগলেন নিজেদের ইষ্টদেবতাকে। ইষ্টদর্শনের, সব সাধনের সিদ্ধিকে পেয়ে কি মনে রাখা যায় প্রতিজ্ঞা ? তাই তাঁরা অবনত সেই পরম নির্ভর চরণতলে।

সেদিনের সেই পরম মুহূর্তে রামলাল দেখেন, যে ইষ্টকে তিনি সম্পূর্ণরূপে

দেখেন নি কখনও, যাঁর পা দেখলে মুখ থেকেছে দৃষ্টির বাইরে, কিংবা মুখ দেখলে পা—সেই ইষ্ট আজ পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত তাঁরই নয়নসম্মুখে।

রামদত্ত অঞ্জলি ভরে ও রাঙাচরণে দিলেন অঞ্জলি—ঠাকুর বললেন, চৈতন্য হোক।

অক্ষয় সেন দিলেন দু'টি জহুরি চাঁপা—তাঁকেও বক্ষস্পর্শ করে বললেন, চৈতন্য হোক।

বেলেঘাটার হারান দাসের মাথায় রাখলেন শ্রীচরণ, কৃপা বিতরণে কল্পতরু সেদিন ঠাকুর। তাঁর সেভাব দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন অক্ষয়, ওরে কে কোথায় আছিস আয়—মুঠো মুঠো অভয় কুড়িয়ে নে, আশ্বাসে ভরে নে অঞ্জলি। চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কুড়িয়ে নে ভারে ভারে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, যার যা খুশি নিয়ে যা। ওরে ঠাকুর আমাদের কল্পতরু হয়েছেন, কল্পতরু। এমন দিন আর পাবি না রে। ওরে আয়। আয়।

এগিয়ে আসেন বৈকুণ্ঠ সান্যাল। আমাকে কৃপা করুন—স্পর্শ করুন আমাকে।

তোমার তো সব হয়েই গেছে।

আপনি যখন বলছেন, তখন হয়ে গেছে তাতে ভুল কি? তবু, অল্পবিস্তর যাতে একটু বুঝতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।

এলেন বৈকুণ্ঠ। স্পর্শ করলেন তাঁর বুক।

সঙ্গে সঙ্গে, একি—একি বিরাট—একি অনন্ত—একি সুন্দর--একি ভয়ঙ্কর। সর্বত্রই যে তুমি—প্রভু আমার এই মহাজগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই যে শ্রীরামকৃষ্ণময়। প্রভু তোমার ওই বিরাট বিশাল রূপ প্রতিসম্বরণ কর, হৃদয় যে আমার দীন-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমি আর সইতে পারছি না।

একদিন নয়, তিন তিনদিন বৈকুণ্ঠের কাটল ওইভাবে। শুধু রব, ওরে কে কোথায় আছিস আয়। অমৃতময়কে স্পর্শ করে ধন্য হ সবাই।

নবগোপাল, অতুল, হরমোহন, কিশোরী, রামলাল সবাইকে করলেন স্পর্শ।

সেদিন সেখানে পশুপাখি—গাছ পাতা যা ছিল সবই যেন মুখর শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ধ্বনিতে, চারিদিকে শুধু ডাক—আয়—আয় নিয়ে যা' ঠাকুর আমাদের কল্পতরু—শতাব্দীর পর শতাব্দী ছড়িয়ে পড়বে এঁর করুণা—আজ এঁকে দর্শন করে, স্পর্শ করে ধন্য হ।

সেদিন ঠাকুরের যাঁরা সন্ন্যাসী ভক্ত তাঁরা কিন্তু কেউ এলেন না। বরং এই অবকাশে মনের উল্লাসে, ভক্তির আবেশে গোছাতে লাগলেন ঠাকুরের ঘর।

পরিপাটি করে পাততে লাগলেন তাঁর বিছানা। সেবার মধ্যে দিয়ে আরো নিবিড়ভাবে—আরো কঠিন পাকে বাঁধতে লাগলেন তাঁরা তাঁদের জীবন দেবতাকে।

দিন হয়ে আসে অবসান।

সময় বুঝি হয়েছে খেলা ভাঙার।

আনন্দ তো অনেক হলো, এবার চল নিজ নিকেতন। আসে ডাক ওরে ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে।

সেই ঘরে ফিরে যাবার ইঙ্গিতই যেন দিকে দিকে। যত মত, তত পথের সন্ধান দিয়ে, ভক্ত বাছাই করে, ত্যাগ ও সেবাব্রত দীক্ষিত সন্তানদেব মঠস্থ করার প্রস্তুতি তো শেষ। আর কেন? এবার সাঙ্গ কর খেলা।

প্রভু আমাদের, এত যন্ত্রণা তোমার, তবু হাসিমুখে দেখাচ্ছ পথ। কিন্তু তোমার ওই যাতনা যে সহ্য করতে পারছি না প্রভু।

তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি—সব্বাই যদি বল যে এত কষ্ট তবে দেহ যাক—তা হ'লে দেহ যায়।

তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে তাই শরীর ত্যাগ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে।

ঠাকুরের ওকথা শোনার পর অজানা অথচ নিশ্চিত আশঙ্কায় থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছিল ভক্তগণ।

আনন্দঘন ঠাকুর সবাইকে নিঃশেষে আনন্দ বিলিয়ে এমনি করে নিয়ে নিলেন সব হলাহল। একেই বুঝি বলে ভক্তের অন্য দেহপাত—একেই বলে ক্রুশি-ফিকেশন।

পাপহরণ করে যে কালব্যাধিকে নিয়েছেন অঙ্গে তাতে দেহপাত হবেই। হবে বলে নিশ্চেষ্ট থাকব। কোন চেষ্টা করব না আমি? ছেলেরা চেষ্টা করছে করুক, ওদের পথে, আমি দেখি আমার পথে।

আমি তারকেশ্বর যাব।

মা সারদামণির একথা শুনে ঠাকুর বলেন, কেন গো, বাবার কাছে ধন্না দিতে?

মাথা নিচু করেন মা।

কি হবে ওতে?

একবার আমি সিংহবাহিনীকে জাগিয়েছি আর কি বৃষবাহন পাগলা ভোলা বাবা তারকনাথকে জাগাতে পারবো না?

বেশ তো, তোমার যখন ইচ্ছা তখন যাও না। ফল কি হবে তাতো আমি জানি। ঠাকুরের মুখে যেন কৌতুকের হাসি।

তবু মা সারদা গেলেন। ধর্ণা দিলেন বাবা তারকনাথের কাছে নিরম্বু থেকে।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন। না—কোন আশা নেই। কোন সংকেত নেই বাবা তারকনাথের। তবে কি জাগবেন না বাবা? তৃতীয় রাতে অর্ধজাগরণে, অর্ধতন্দ্রায় কিসের যেন একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল মা'র। যেন কতকগুলো হাঁড়ি পড়ে ভেঙে গেল। কে যেন লাঠি দিয়ে ভাঙছে হাঁড়ির সারি।

মা'র দুচোখ বেয়ে নেমে আসে জল। আশা নেই, নেই কোন ভরসা। সেই ভোররাতেই স্নানকুণ্ড থেকে কয়েকবিন্দু চরণামৃত তুলে দিলেন কণ্ঠে।

তারপর ফিরে এলেন আবার কাশীপুরেই।

কি গো? কৌতুকে যেন ঝলমলিয়ে ওঠেন ঠাকুর। কি হলো? লবডঙ্কা—লবডঙ্কা তো! নিজের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন ঠাকুর, বলেছিলাম না।

তুমি তো বলেই ছিলে, তবু প্রাণ মানে কই, মন যে মানে না। তাই তো ঘুরে ফিরে—দোরে দোরে এই কান্না। অবনতমুখী মা'র দিকে তাকিয়ে ঠাকুর তখনও মমতায়, কৌতুকে আশ্চর্য এক মোহময়।

পৌষের সেই শীতের রাতে নরেন্দ্ররও হৃদয়ে বুঝি জেগেছিল সেই শঙ্কা। তাই ঘুমোতে না পেরে শরৎ, গোপাল প্রভৃতি কয়েকজনকে ডেকে বললেন, চল্ একটু বাগানে যাই আর তামাক খাই।

বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তিনি বললেন, ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহ-রক্ষার সঙ্কল্প নিয়েছেন কিনা কে জানে? সময় থাকতে থাকতে তাঁর সেবা আর সাধনভজন করে যে যতটা পারিস আধ্যাত্মিক উন্নতি করে নে। না হলে তিনি সরে গেলে কিন্তু অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। এটা করবার পর ভগবানকে ডাকব, ওটা হলে সাধনভজন করব—এই ভেবে ভেবে তো দিনগুলো যাবে, আর বাসনার জালে জড়িয়ে পড়ছি সবাই। বাসনাতেই সর্বনাশ—বাসনাতেই মৃত্যু।

এইসব বলতে বলতে একজায়গায় জড়ো করা শুকনো পাতা আর গাছের

স্তূপ দেখিয়ে হঠাৎ-ই নরেন্দ্রনাথ বললেন, দে আগুন লাগিয়ে। সাধুরা এইসময়ে গাছের তলায় ইনি জ্বালিয়ে থাকে। আমরাও ধূনি জ্বালিয়ে অন্তরের নিভৃত বাসনা দগ্ধ করি।

জ্বলে উঠল আগুন।

স্তব্ধ নিশীথে পবিত্র পাবক শিখা উঠল উর্ধ্বে।

হে অগ্নি, এই নাও আমার বাসনা।

এই নাও আমার অর্থলিপ্সা।

এই নাও যশোকাঙ্ক্ষা।

এই নাও আমার আমিত্ব।

পরমসুখে সেদিন তাঁরা সেই অগ্নিতে সব কামনাবাসনা অর্ঘ্য দিয়ে হলেন মনের দিক থেকে সন্ন্যাসী। হলেন বৈরাগী।

দিন দিন এদিকে ঠাকুরের অবস্থার কিন্তু অবনতিই হতে থাকে। হঠাৎ কোনদিন হয়ত কোন ওষুধে ভাল থাকেন। হন মুখর, সমাধিতে মগ্ন। তারপরই আবার অবস্থার অবনতি। ডাঃ সরকার তাঁর ঝুলি উজাড় করে ফেলেছেন কিন্তু আত্মারামকে দিতে পারছে না আরাম।

মাঝে মাঝে ভক্তদের আকুলতা, দুঃখ দেখে প্রাণ কেঁদে ওঠে ঠাকুরেরও। তোমাদের এই কষ্ট যে দগ্ধ করছে আমাকেও। ওগো তোমরা বল, এ দেহ যাক। তোমাদের ওই কষ্ট যে আমি সহ্য করতে পারছি না।

নিজের নয়, ভক্তের বেদনায় তিনি বেদনার্ত, ভক্তের কষ্টে তিনি কাতর।

সেদিন আকাশে নেই এতটুকু মেঘ। তবু দুপুরটা যেন নয় তেমন প্রসন্ন। কেমন যেন চাপ মনের ওপর। এমন সময় প্রচণ্ড গর্জনে পড়ল বাজ।

এ যে বিনামেঘে বজ্রপাত।

এ কিসের সংকেত।

ছুটে আসেন মা। ছুটে আসেন ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মীদিদি। তাঁদের সেই উদ্বেগ দেখে রঙ্গময় ঠাকুর বলেন, কিগো, ভয় পেয়ে ছুটে এসেছ বুঝি? এ যে লীলাবসানের সঙ্কেত গো। মনে নেই রামাবতারে এসেছিলেন কালপুরুষ। এবার বজ্রধ্বনিতে সংকেত—দিন আর নেই। খেলাঘর ভেঙে দাও এবার।

সেকথা শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন লক্ষ্মী।

কিসের কান্না, কিসের শোক? এখানকার কত কথাই তো শুনলি, কত

কিছুই তো দেখলি—তাই শোনাবি লোককে। সে তো সব আনন্দের কথা—অমৃত কথা। আর কতদিনের জন্যই বা এই তিরোধান। শোন একশ বছর—মোটে একশ বছর।

উৎসুক চোখে তাকান লক্ষ্মী, তাকান মা সারদা।

একশ বছর পরে আবার আসবো।

আবার আসবে? এই একশ বছর থাকবে কোথায়? জগতের হয়ে এ প্রশ্ন মা'র।

কেন ভক্তহৃদয়ে। ভক্তের হৃদয় যে আমার বৈঠকখানা। ভক্তহৃদয় যে আমার ঘরবাড়ি।

যাবার আগেও চিরন্তনের সান্ত্বনা। শুধু এ জন্মেই নয়, জীবনে মরণে জনমে জনমে আমি রব তব সাথী। শুধু একেকে নয়, বহু—বহু বহুকে উদ্ধার করার এ এক জলন্ত আশ্বাস।

শোনো। চুপি চুপি ঠাকুর ডাকলেন মা সারদাকে।

কাছে এলেন মা। বললেন, কি?

আমার ইষ্ট-কবচটা তুমি রাখ।

না। প্রায় যেন ছিটকে গেলেন মা। কেমন করে নেবেন তিনি। এই কবচ দেওয়ার অর্থ যে জানেন তিনি। এ যে নিশ্চিত বিদায়ের ইঙ্গিত।

ওগো, রাখ এটা রাখ।

না, এটা তোমার কাছেই থাক। ততক্ষণে কবচ খুলে ফেলছেন ঠাকুর। মা'র হাতে সেটি সঁপে দিয়ে যেন পরম নিশ্চিন্ততায়।

এমনি নিশ্চিন্তই তিনি হলেন নরেনকেও তাঁর সর্বস্ব সঁপে দিয়ে।

শ্রাবণের তখনও বাকি বেশ কয়েকদিন। যোগীনকে ডাকলেন ঠাকুর। বললেন, পাঁজিখানা নিয়ে বোস। পঁচিশে শ্রাবণ থেকে পরপর দিনগুলো তিথি নক্ষত্র বলে যা তো।

হতভম্ব যোগীন পাঁজি নিয়ে বসেন। বলে যান পরপর দিনের কথা। ৩১ শ্রাবণ আসতেই বললেন, থাম।

যোগীন তখন প্রায় নিস্পন্দ। থামতে বললেন কেন?

বেশ দিন। বেশ রাত্রি। বেশ তিথি। ঝুলন পূর্ণিমা।

এসব কি বলছেন ঠাকুর? এ কিসের ইঙ্গিত? ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে যোগীনের।

ঠাকুর বলেন, যা একবার নরেনকে পাঠিয়ে দে। নরেনের সঙ্গে শশীও আসেন। শশীকে বলেন, যা বাইরে যা, দেখিস কেউ যেন না আসে। চলে যায় শশী।

নরেনকে আবার বলেন, যা আশপাশটা উঁকি মেরে দেখে নে—কেউ আছে কিনা?

না কেউ নেই।

তবে বোস আমার কাছটিতে।

বসেন নরেন কিন্তু ভাবেন, এত সতর্কতা কেন? মনে পড়ে নরেনের। এমনি একদিন তাঁকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নেই। তা তোর মধ্য দিয়ে করব। সেদিন একথায় হটিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরকে। কিন্তু আজ? আজ কি বলবেন তিনি? কি শোনাবেন।

একদিন নরেন বলেছিলেন ঠাকুরকে, আমি শান্তি চাই, আমি ঈশ্বর চাই না।

আজ এই মুহূর্তে ঠাকুরের পাশটিতে বসে নরেনের মনে হয়, আহা ঈশ্বরই তো শান্তি। অনন্ত অনাবিল শান্তির ধারায় তিনি যেন হচ্ছেন নিষ্ণাত। তাঁর দেহ মন সব কিছু শান্তির স্পর্শ পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। তিনি অনুভব করতে পারছেন শান্তি কাকে বলে।

অপলক নয়নে চেয়ে আছেন ঠাকুর। চেয়ে আছেন নরেনও। এক আশ্চর্য দ্যুতিকে যেন প্রত্যক্ষ করেন নরেন। দেখেন ওই রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে আশ্চর্য এক জ্যোতি। জ্যোতি ওই দুই চোখে। সে জ্যোতির আভায় চারিদিক আলোকিত। সে আলো ছাড়া এই জগৎসংসারে যেন আর কিছু নেই। নরেন ভাবতন্ময়।

তন্ময়তা ভাঙল কান্নার শব্দে। নরেন দেখেন ঠাকুর কাঁদছেন।

একি, আপনি কাঁদছেন কেন?

নরেন আমার যা কিছু ছিল, আমার যথাসর্বস্ব তোকে আজ দিয়ে দিলুম। নরেনের হাতখানি ধরে ঠাকুর বলেন, নরেন আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হয়ে গেলুম, ফতুর হয়ে গেলুম। তুই রাজ্যেশ্বর হয়ে গেলি।

এ তো কান্না নয়, এ যে আনন্দের গঙ্গাবারি। সেই বারিতে হ'ল অভিষেক নরেনের—স্বামী বিবেকানন্দর।

সেই অভিষেকের মুহূর্তে কাঁদতে থাকেন নরেনও। ঠাকুর কিন্তু বলে যান, তুই সবাইকে আঁকড়ে থাকবি, সকলের আশ্রয় হবি। সকলের ভার তোর হাতে

দিয়ে গেলুম। তুই হবি বটবৃক্ষের মত। তারপর তোর কাজ যখন ফুরুবে, যখন একদিন বুঝতে পারবি তুই সত্যি কে, ফিরে যাবি স্বধামে।

ভবিষ্যৎকে বর্তমানের পটে বসিয়ে গেলেন ঠাকুর নিজেই। তবু সংশয় যায় না, যায় না প্রশ্ন।

শেষের সে রাতে, মহাযোগী যখন মহাযোগে মগ্ন সেই মুহূর্তে সেখানে বসে থেকে নরেনের সংশয়াকুল মন বলে উঠল, এখন, এই ক্ষণেও এই যন্ত্রণার মধ্যেও যদি তিনি বলতে পারেন—তিনি সেই ঈশ্বরের অবতার তাহলেই বিশ্বাস হয় সব। নচেৎ—নেতি। নেতি।

আর ঠাকুর সেই সমাধি থেকে মুহূর্তের জন্য স্ব-ভূমে এসে বললেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ ইদানিং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তবে এ তোর বেদান্তের দৃষ্টে নয়।

আর প্রশ্ন নয়, নয় কোন জিজ্ঞাসা। এবার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

৩১ শ্রাবণ, ১২৯৩ সাল।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট।

কি জানি এক অশুভ আশঙ্কায় সকাল থেকে চঞ্চল মা সারদার মন। ছাদে শুকোতে দিয়েছিলেন দেশি কাপড়খানা—সেটা আর পাওয়া গেল না। হাত থেকে কুঁজোটা পড়ে ভেঙে গেল। ভক্ত সেবকদের জন্য খিচুড়ি রাঁধছিলেন, তলাটা ধরে গেল। যে কোন কাজ করতে গিয়ে চোখ দুটো ভরে আসছে জলে।

আজ ঠাকুরের যন্ত্রণাটা যেন বেড়েছে অতিমাত্রায়। বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে, যদি যন্ত্রণা কমে। কিন্তু কোথায় কি? যেন এক আশ্চর্য অস্থিরতা আবার আশ্চর্য এক প্রসন্নতা। মা আর লক্ষ্মীদিদি আসতেই বললেন, 'এসেছ, দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি—জলের ভিতর দিয়ে—অনেক দূর।'

সে কথায় কেঁদে উঠলেন মা।

কাঁদছ কেন? তোমার ভাবনা কি? যেমনি ছিলে তেমনি থাকবে। আর এরা আমায় যেমন করছে তোমায়ও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখ কাছে রেখ।

বিকেলের দিক থেকে যেন যন্ত্রণা আরো বাড়ল। ফুটে উঠতে থাকল মহাপ্রস্থানের ইঙ্গিত। গিরিশভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ নাড়ী দেখে বললেন, আলো নেভার দেরি নেই।

ডাক্তার ডাকতে ছুটল শশী। ডাক্তার বাড়ি নেই। কলে গেছে। কোথায় গেছে? দেখ এদিক ওদিক। মাইলখানেক ছুটে শশী ধরল ডাক্তারকে। এখুনি যেতে হবে। জরুরি কল আছে যে? এর চেয়েও জরুরি?

ডাক্তার এলেন। দেখলেন। নিরাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। সন্ধ্যার সময় ঠাকুর চোখ খুললেন, স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, সারাদিন দেবতাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। আমি এখন খাব। ভারি খিদে পেয়েছে।

ব্যস্ত ভক্তরা তাড়াতাড়ি কিছু তরল পথ্য নিয়ে এলেন। কিন্তু না গিলতে পারলেন না প্রায় কিছুই।

হরি ওঁ তৎসৎ বলে ঘুমিয়ে পড়লেন, না আবার যোগাবিষ্ট হলেন তিনি।

ভক্তেরা ভাবেন, একটু যদি খেতে পারতেন!

তা নরেনও বলেছিলেন ঠাকুরকে। বলুন না, একটু মা-কে।

ঠাকুর বলেছিলেন, উত্তরটা শোনালেন তিনি নরেনকে। মা বললেন শতমুখে খাচ্ছিস, তবু খাবার বাসনা। ভক্তদের মুখেই যে হয় ভগবানের আহার।

আজ এই মুহূর্তে ভক্তরা কিন্তু ভাবেন, যদি একটু খেতে পারতেন।

অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যায়। মধ্যরাত্রে আবার সমাধি। শরীর যেন শক্ত হয়ে উঠল। কেঁদে উঠলেন শশী।

নরেন শুধু শান্ত সংযত। রাম আর গিরিশকে খবর পাঠাও। কোনো ভয় নেই—এস হরি ওঁ তৎসৎ কীর্তন করি।

চলল অস্ফুটস্বরে কান্না-ভাঙা কীর্তন। রাত প্রায় একটা। বাহ্যজ্ঞান ফিরল ঠাকুরের। স্পষ্ট সুস্থস্বরে বললেন, আমি খাব। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

খাবেন? কি খাবেন?

ভাতের পায়েস।

এল ভাতের পায়েস। ঠাকুর বললেন, বসে খাব। বসানো হ'ল ঠাকুরকে বিছানার ওপর বালিশ ঠেস দিয়ে। শশী খাওয়াতে লাগল তাঁকে। আশ্চর্য স্বাভাবিকতায় অনায়াসে খেতে লাগলেন তিনি। যেন কণ্ঠে নেই তাঁর কোন

ক্ষত। সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি। বললেন, এত খিদে যে ইচ্ছে হয় হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাই।

পায়েস খেতে খেতেও খিচুড়ি কেন? একি রামকৃষ্ণ অবতারের বিশেষ প্রিয় ভোজের নির্দেশ? নাকি সকালে যে পেয়েছিলেন খিচুড়ি পোড়ার গন্ধ তারই ইঙ্গিত। তবে ইঙ্গিত যারই হোক নির্দিষ্ট হয়ে রইল শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার ভোগ—খেচরান্ন। জগন্নাথের যেমন মহাপ্রসাদ তেমনি ভবিষ্যতের সর্ব মতের, সর্ব পথের পথিকদের মিলন হবে যে ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রের প্রসাদ হিসেবে চিহ্নিত হ'ল খেচরান্ন।

রাত ১টা ২ মিনিট। সহসা বিদ্যুৎপ্রবাহের মত একটি শিহরণ সারা শরীরে। চক্ষু দুটি স্থির। সারা আননে আশ্চর্য এক জ্যোতি—মধুর এক হাসি। স্ফুরিত হ'ল বাক্য—কালী—কালী। তারপরই সব শেষ। চিরস্তব্ধতা। অথবা চিরকালের জন্য তিনি ধরা রইলেন ভক্তের হৃদয়ে।

ঠাকুরের সেই মহাসমাধি দেখে সর্বসমক্ষে মা প্রাণের আবেগে চিৎকার করে বলে উঠলেন, মা কালীগো, তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো?

কান্নার গমকে ভারি হ'ল বাতাস। চরম শূন্যতায় ভরে উঠল হৃদয়। সব পেয়েও সব হারানোর ব্যথায় উতরোল হলো অন্তর।

যিনি ছিলেন বাইরে, তিনি এলেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে। নয়নসমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'—এই বোধে ক্রমে আত্মস্থ হলেন সবাই।

পরদিন দুপুরে মহাপ্রস্থিত সেই মহসাধকের দেহ নিয়ে শেষযাত্রা কাশীপুর মহাশ্মশানে।

চন্দনকাঠের চিতায় ও-দিব্যতনুকে স্পর্শ করে অগ্নি যেন ম্লান হয়ে গেল ও-দেহের জ্যোতির কাছে।

সেই চরম শোকের মুহূর্তেও পরমকে অন্তরে উপলব্ধি করার আনন্দেই চিতার পাশে শোকাশ্রুগম্ভীর কণ্ঠে চিরঞ্জীব শর্মা গাইছেন, 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ সুখ-দুঃখের ভিতরে।' 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গমণি অবাক অবাক হয়েছি। হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।'

আর সেবার প্রতিমূর্তি শশী যন্ত্রণাদগ্ধ ঠাকুরের বরতনুকে এতদিন যেমন করে এসেছেন ব্যজন, আজ এই মুহূর্তে বহ্নিমান চিতার পার্শ্বে বসেও তেমনি অবিচল ভাবেই করে যাচ্ছেন বাতাস।

শশী কি পাগল হয়ে গেছেন? গুরুবিরহে মানসিকবৈকল্য এসেছে তাঁর? না হলে প্রজ্জ্বলিত চিতাকে কেউ বাতাস করে পাখা দিয়ে?

না, শশী জানেন, স্থূলচোখে গুরুর জড়দেহ অন্তর্হিত—কিন্তু তিনি যে পরমাত্মা—পরমপুরুষ—তাঁর ক্ষয় নেই। বিনাশও নেই। তিনি অজ, তিনি নিত্য, তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত, অবিকারী, তিনি শাশ্বত, পুরাণ—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অস্ত্রাঘাতে এই আত্মাকে ছেদন করা যায় না, অগ্নি এঁকে দহন করতে পাবে না, বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না। ইনি যে সেই আত্মা। পরমাত্মা।

দেহে যাঁকে করতেন সেবা, বিদেহী সেই তাঁকেই সেই মুহূর্তে সেবা করছেন শশী। গুরুর সেবাতেই তাঁর আনন্দ। সেই কল্পতরুর ছায়ায় বসে উত্তরজীবনে তাই তিনি রামকৃষ্ণানন্দ।

১৮৮৬-র ১৬ আগস্ট জাতির জীবনে চিহ্নিত হয়ে রইল মহাবিষাদের আবার মহাউদ্বোধনের দিন হিসেবে।

শাশ্বত এক কল্পবৃক্ষের আশ্রয়ে শতাব্দীর পরও মিলছে করুণা, মিলছে অভয়। মিলছে পথের দিশা।

করুণাসাগর তিনি জীবনে।
মহাসাগর তিনি মহাপ্রস্থানে।
তিনি মধুর, শাশ্বত, সচ্চিদানন্দ।
তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন।
তাঁর মধুর কণ্ঠের আশ্বাস—
ভয় কিরে পাগল, আমি তো আছি—
নয় শুধু কথা,
চিরসঞ্জীবিত মহামন্ত্র।
শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পবৃক্ষে আজও প্রার্থনা—
হে মহাভাগ।
গ্রহণ কর অবনত প্রাণের প্রণতি।
শান্তি দাও, দাও আশ্রয়,
সান্ত্বনা, প্রেরণা
প্রাণে দাও অক্ষরকে
জানার এষণা।

বলরাম মন্দির :

ঠাকুরের ভাষায় মা কালীর দ্বিতীয় কেল্লা বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুরের পদার্পণের প্রথম লিখিত তারিখটি হচ্ছে ১৮৮২ সালের ১১ মার্চ। আর শেষে আসেন ১৮৮৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। ছিলেন ২ অক্টোবর পর্যন্ত।

৫৭ নম্বর রামকান্ত বসু স্ট্রীটের (বর্তমানে ৭ গিরিশ এভিনিউ) বাড়িটি ছিল বলরাম বসুর। এই ভবনেই ১৮৯৭ সালের পয়লা মে রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোশিয়েশনের সূচনা।

বলরাম বসুর ছেলে রামকৃষ্ণ বসু তাঁর উইলে এক ট্রাস্ট ডিড তৈরি করে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর এটি মিশনের হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দিয়ে যান। সেইমত বলরাম ভবন এখন মঠ ও মিশনের পরিচালনাধীনে পরিচিত বলরাম মন্দির হিসেবে। বর্তমান কর্মাধ্যক্ষ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ মহারাজ।

শ্যামপুকুর বাটী :

গোকুল ভট্টাচার্যের ৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয় ঠাকুরকে কলকাতায় রেখে চিকিৎসা করার জন্য। এখানে তিনি ছিলেন ১৮৮৫ সালের ২ অক্টোবর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বাড়িটির বর্তমান নম্বর ৫৫এ ও ৫৫বি শ্যামপুকুর স্ট্রীট। উঠোনে দু'ভাগের মাঝখানে করোগেট টিনের বেড়া।

এ বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯৭৮ সালের ২৭ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের অন্যতম হলেন কথামৃতকার মাস্টারমশাই শ্রীম'র প্রপৌত্র গৌতম গুপ্ত। তিনিই বর্তমানে এর সম্পাদক। এখন নিয়মিত-ভাবে সন্ধ্যায় এখানে হয় নানা ধর্মানুষ্ঠান।

কাশীপুর উদ্যানবাটী :

লালাবাবু এবং রানী কাত্যায়নীর জামাই গোপালচন্দ্র ঘোষের এই বাগান বাড়িটি ভাড়া নিয়েই ১৮৮৫ সালের ১১ ডিসেম্বর ঠাকুরকে আনা হয় এখানে।

এই উদ্যানবাটীতেই ১৮৮৬ পয়লা জানুয়ারি ঠাকুর হন কল্পতরু।

এখানেই নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে দেন গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ। সূচনা হয় ভাবী রামকৃষ্ণ সংঘের।

এখানেই নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ঠাকুর সঞ্চারিত করেন তাঁর সমস্ত শক্তি এবং ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট এখানেই মহাসমাধিমগ্ন হন ঠাকুর।

১৯৪৬ সালে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ উদ্যানবাটীর অর্ধেকটি কিনে মঠ স্থাপন করেন এবং ১৯৪৯ সালে বাকি অংশও মঠ কিনে নেন। উদ্যানবাটীর সেই আগের রূপটি রেখেই বর্তমানে উদ্যানবাটীটির সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। সে কাজের জন্য যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজনের দানে তা মিটবে বলে আশা। উদ্যানবাটী রামকৃষ্ণ মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী পুরাণানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান ঃ

কাশীপুর উদ্যানবাটি থেকে এক মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে এই মহাশ্মশান। এখানেই পঞ্চভূতে বিলীন হয় ঠাকুরের স্থূল শ্রীদেহ। এটি পৌরসভার অধীনে আসার পর এর নাম করা হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান। বর্তমানে এখানে একটি স্মারক মন্দিরও স্থাপিত হয়েছে।

১৯১৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় ভক্তরা ওঁ মাভৈঃ বিপদনাশিনী শ্মশানেশ্বরী তারা মা সমিতি গঠন করে ঠাকুর ও তারা মা'র নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেছেন। সমিতিই কল্পতরু উৎসব সমিতি পালন করেন কল্পতরু উৎসব এবং ঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোধান তিথি। ৭ ফেব্রুয়ারি সেটা পালিত হয় তিনচারদিন ধরে মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব। সমিতির ঠিকানা ৫ চন্দ্রকুমার রায় লেন, কলকাতা-২।

———